বড়দের লেখা

কারবালার সঠিক ইতিহাস

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

হযরত মুফতী ছাহেব দা.বা. লিখিত 'ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস ও কারবালার সঠিক ইতিহাস' গ্রন্থের চয়িতাংশ

হযরত মুআবিয়া রাযি. এবং তাঁর কীর্তিময় শাসনামল:

হযরত মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি.। তিনি ছিলেন একাধারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থাভাজন সাহাবী, বিশ্বস্ত ওহী-লেখক, দূরদর্শী সেনাপতি, বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক। সুদীর্ঘ একচল্লিশটি বছর অত্যন্ত সুচারুরূপে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ও গোলযোগপূর্ণ বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবশেষে মুসলিম উম্মাহর আমীরুল মুমিনীন পদে বরিত হয়েছেন।

সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন হযরত উসমান রাযি.-এর অনুমতিক্রমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৭ হিজরীতে ইসলামী ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৌবহর নিয়ে সাইপ্রাস-অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে অশংগ্রহণকারীদের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছিলেন– "আমার উম্মতের প্রথম যে সৈন্যদলটি নৌ-অভিযানে অংশ নিবে, তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।"

খিলাফত লাভের পর হযরত মুআবিয়া রাযি. কাফের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মুসলিম জাহানের সীমান্ত সম্প্রসারণের ধারা বেগবান করেন। তার খিলাফত-কালে মধ্য এশিয়ার সিজিস্তান, সুদান, কাবুল ও সিন্ধুর অংশবিশেষ বিজিত হয়। সিসিলি, কনস্টান্টিনোপল ও সমরকন্দ অভিযান এবং আমু দরিয়া অতিক্রম করে প্রথমবারের মতো বোখারায় সৈন্য প্রেরণ তারই শাসনামলে সংঘটিত হয়। তিনি ৪৫ হিজরীতে আফ্রিকা মহাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং এর বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড ইসলামী খিলাফতের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেন। তারই খিলাফতকালে মিসর ও সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে বহু জাহায নির্মাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্পকালের মধ্যে ১৭০০ বৃহদায়তন শক্তিশালী জাহাযের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক বিশাল নৌবহর।

ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর সুদীর্ঘ শাসনামলের পর্যালোচনা করত নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন– "তাঁর শাসনামলে জিহাদের ধারা অব্যাহত ছিল। আল্লাহর দীন দুর্বার গতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে চলছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গনীমতলব্ধ সম্পদের ঢল নেমেছিল। মোটকথা, তাঁর শাসনছায়ায় মুসলিম জনসাধারণ সুখ-শান্তি এবং ইনসাফ ও সমৃদ্ধপূর্ণ জীবন যাপন করছিল।"

ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন প্রসঙ্গ:

ইয়াহুদী সাবায়ী চক্র ও খারেযী মুনাফিকদের চক্রান্তে সংঘটিত ভ্রাতৃঘাতি জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের নির্মম ও শোকাবহ দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করে ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে হযরত মুআবিয়া রাযি. পেরেশান হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি মুসলিম উম্মাহকে রাখালবিহীন মেষপালরূপে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে পরবর্তী খলীফা মনোনয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। সে মতে ব্যাপারটি নিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ কামনা করেন।

ইতোপূর্বে বিভিন্ন অভিযানে ইয়াযীদের তৎকালীন সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতায় জনাসাধারণ এবং অধিকাংশ বিশিষ্টজন মুগ্ধ ছিলেন। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে অধিকাংশ জীবিত সাহাবীই তখন ইয়াযীদের মনোনয়নকে সমর্থন করেন। ফলে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলের সুধী ও গুণীজনেরা নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিনিধিসহ হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর নিকট দামেশকে আগমন করে নিজেদের পক্ষ হতে ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের প্রস্তাব দিতে থাকেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. তাদেরকে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তড়িঘড়ি করা ঠিক হবে না মর্মে জানিয়ে দেন।

পরবর্তী সময়ে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নরগণও ইয়াযীদকে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জানাতে থাকেন। তখন হযরত মুআবিয়া রাযি. ইয়াযীদকে মনোনয়ন প্রদানে মনস্থ করেন এবং প্রশাসন ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের মত অনুযায়ী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু হেজায তথা মক্কা-মদীনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারে এই বলে আপত্তি জানালেন যে, নবীদৌহিত্র হযরত হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর রাযি. যেহেতু এখনও জীবিত আছেন এবং তারা সকলেই সাহাবী হওয়ার পাশাপাশি নেতৃত্বদানের জন্য ইয়াযীদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত ও উত্তম, কাজেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উত্তমের বর্তমানে অনুত্তম ইয়াযীদকে মনোনয়ন দেয়া ঠিক হচ্ছে না! কিন্তু তাদের মতামত এজন্য প্রাধান্য পেলো না যে, ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ ইয়াযীদের মনোনয়ের ব্যাপারে সমর্থন দিয়েছেন এবং ইয়াযীদ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের তুলনায় উত্তম না হলেও বাহ্যিক দিক দিয়ে খিলাফত পরিচলনায় অযোগ্য ছিল না। আর বিশেষ উপযোগিতা বিবেচনায় উত্তমের বর্তমানে অনুত্তমের খিলাফত পরিচালনা বিধি-বহির্ভূত নয়।

যা হোক, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং বিশিষ্টজনের পরামর্শ-সাপেক্ষে ইয়াযীদকে পরবর্তী উত্তরসুরী মনোনয়ন দানের পর হযরত মুআবিয়া রাযি. হায়াতের শেষদিকে বেশ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করার পর হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় তাশরীফ আনলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর রাযি. ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-কে ইয়াযীদকে খলীফা ঘোষণার ব্যাপারে পৃথক-পৃথকভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাদেরকে রাজী করানো যাচ্ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বললেন, আপনার পূর্বে যারা খলীফা ছিলেন তাঁদেরও অনেক যোগ্য সন্তানাদি ছিল। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তারা ইয়াযীদের চেয়ে

অনেক উর্ধ্বে ছিলেন, তবুও তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এ দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তাঁরা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খিলাফতের দায়িত্ব অন্যের হাতে অর্পণ করে গেছেন। অথচ আপনি আপনার সন্তানের জন্য এ কাজটি করে যাচ্ছেন!

এভাবে এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে হযরত মুআবিয়ার রাযি.-এর মতবিনিময় হয়। তবে সকলেই ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন। সর্বোপরি হযরত হুসাইন রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-সহ আরও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরামর্শ দেন যে, আপনি আমাদেরকে ইয়াযীদের হাতে বাইআতের জন্য শক্তি প্রয়োগ করবেন না। আমরা আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি, এর যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের সঙ্গে আপনার অন্য কোন বিরোধ নেই। প্রস্তাব তিনটি হল—

এক: খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ আপনি কাউকে মনোনীত না করে মুসলমানদের উপর এ দায়িত্বভার ছেড়ে দিন। তারা যাকে ভালো মনে করেন তিনিই আমীরুল মুমিনীন মনোনীত হবেন।

দুই: আপনি আমীরুল মুমিনীন হযরত আবূ বকর রাযি.-এর পন্থা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি এমন কোন ব্যক্তির নাম পেশ করুন যার সঙ্গে আপনার বংশীয় কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তার মধ্যে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও বিদ্যমান থাকবে।

তিন: আপনি ফারুকে আযম হযরত উমর রাযি.-এর পদ্ধতি অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি ছয় জন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে যান, যথাসময়ে তারাই পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করে দিবেন। এই তিন প্রস্তাব ছাড়া চতুর্থ কোন প্রস্তাব আমরা মানতে রাজী নই।

হযরত মুআবিয়া রাযি. তদুত্তরে বললেন, ইতোমধ্যে পুরো মুসলিমবিশ্ব ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে। এখন আপনাদের এই বিরোধিতার পরিণাম মুসলমানদের জন্য আদৌ কল্যাণকর হবে না। এ পরিস্থিতিতে সকলেরই উচিৎ হবে ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ করা।

হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর খিলাফতকালে পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার সুযোগ পায়নি। মুসলমানদের পরস্পর মতভেদ এড়ানোর জন্য সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের বৃহৎ অংশের পর মুসলিম জনতার আরও একটি বৃহদাংশ ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার অধিবাসীগণ বিশেষত হযরত হুসাইন রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। তাঁরা কারও ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ইয়াযীদ কোন অবস্থাতেই খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার যোগ্য নয়।

এ অবস্থায় হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর ইন্তিকালের পরে ৬০ হিজরীতে ইয়াযীদ ক্ষমতা গ্রহণ করে। হযরত মুআবিয়া রাযি. স্বীয় জীবদ্দশায় বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের থেকে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশের খ্যাতনামা লোকজন এবং হেজাযের নেতৃবৃন্দ যেমন হযরত ইমাম হুসাইন রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর রাযি. বাইআত হননি। এর বিস্তারিত আলোচনা ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।

একথা স্পষ্ট যে, এসব হযরত নিজেদের ব্যক্তিগত গুণাবলী আর বংশীয় মর্যাদার কারণে সমস্ত উম্মতের উপরে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাদের এই মতবিরোধ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাই ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই ইয়াযীদ এঁদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে আবূ সুফিয়ান তখন মদীনার শাসক ছিলেন। ইয়াযীদ তার নিকট হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যু-সংবাদ পাঠাল আর এসব হযরতের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণের তাকিদ করল। ওলীদ ইবনে উতবা এ বিষয়ে সফলতার জন্য মারওয়ান ইবনে হাকামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যিনি তখন মদীনাতেই থাকতেন। মারওয়ান বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আর আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরের ব্যাপারে চিন্তার কারণ নেই, কেননা তারা ক্ষমতার দাবীদার নন। তবে হুসাইন ইবনে আলী আর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে এক্ষুণি ডেকে ইয়াযিদ-এর পক্ষে বাইআত হতে বাধ্য করো। যদি তারা না শোনে তাহলে জীবিত বাইরে যেতে দিও না। যদি আমীরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে আর তারা বাইআত না হয় তাহলে এরা নিজ নিজ সমর্থকদের নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং বিরোধিতার সুর উঁচু হয়ে যাবে।

ইমাম হুসাইন রাযি. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কর্তৃক ইয়াযীদের বাইআতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন:

ওলীদ ইবনে উতবা হযরত হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-কে ডেকে পাঠালেন। বুযুর্গদ্বয় তখন মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এই অসময়ে ডাকার কারণে তারা ঘটনার গভীরে পৌঁছে গেলেন। পরস্পরে মন্তব্য করলেন যে, মনে হয় আমীরের ইন্তিকাল হয়ে গেছে আর আমাদেরকে ইয়াযীদের পক্ষে বাইআতের জন্য ডাকা হচ্ছে। হযরত হুসাইন রাযি. কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে ওলীদের নিকট পৌঁছলেন। আর সাথীদেরকে বাইরে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, কোন শোরগোল শুনতে পেলে তৎক্ষণাত ভেতরে চলে আসবে। ওলীদ হযরত হুসাইন রাযি.-কে হযরত মুআবিয়ার রাযি.-এর মৃত্যুর সংবাদ জানালেন। হযরত হুসাইন রাযি. ইন্নালিল্লাহ পড়লেন আর আমীরের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। এবার ওলীদ মূল প্রসঙ্গে এসে বাইআতের আহ্বান জানালেন। হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, আমার মত ব্যক্তি গোপনে বাইআত করতে পারে না। আপনি সাধারণ লোকদেরকে এ উদ্দেশ্যে একত্রিত করুন, আমিও তাদের সঙ্গে আসব। সকলের যেটা মত হবে সেটাই করা হবে।

ওলীদ দুশ্চরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি বললেন, খুব ভালো কথা, আপনি তাশরীফ আনুন। হযরত হুসাইন রাযি.-এর প্রস্থানের পর ওলীদ মারওয়ানকে বললেন, বড়ই পরিতাপের বিষয় তুমি চাচ্ছো যে, আমি রাসূল দৌহিত্রকে হত্যা করি!? খোদার কসম! কিয়ামতের দিন যার নিকট হুসাইনের রক্তপণ চাওয়া হবে সে বড়ই হতভাগা প্রমাণিত হবে।

এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ওলীদের নিকট একদিনের সময় চাইলেন। কিন্তু রাতেই তিনি মদীনা ত্যাগ করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। ওলীদ সংবাদ পেয়ে নিজের লোকদেরকে তার পিছু ধাওয়া করতে পাঠালো। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. অপরিচিত রাস্তা বেছে নেয়ায় তারা তাঁর নাগাল পেল না।

মক্কার পথে ইমাম হুসাইন রাযি.

পরের রাতে হযরত হুসাইন রাযি. স্বীয় ভগ্নি উম্মে কুলসুম আর যয়নব এবং

ভাতিজা ও ভাগ্নে যথাক্রমে আবূ বকর, জাফর, আব্বাস এবং আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। তবে তার ভাই মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মদীনা ত্যাগ করা পছন্দ করলেন না এবং বিদায়ের প্রাক্কালে এই নসীহত করলেন– প্রিয় ভাই! তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় আর মাহবুব আমার নিকট অন্য কেউ নেই। ইয়াযীদের পক্ষে বাইআতের অস্বীকৃতি বিষয়ে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। তুমি তার বাইআত হয়ো না বরং নিজের দূতদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করে তোমার পক্ষে বাইআতের আহ্বান জানাও। দেশবাসী যদি তোমার হাতে বাইআত করে তাহলে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তুমি এমন কোন শহরে যেয়ো না যেখানে লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে; একদল তোমার পক্ষে আর অপরদল বিপক্ষে। অতঃপর সেই দুই দলের মধ্যে লড়াই হয় আর তুমি সর্বপ্রথম লড়াইয়ের জন্য বেরিয়ে আসো। আর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত গুণাবলী আর বংশীয় মর্যাদার দিক দিয়ে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল নিকৃষ্ট পন্থায় তার রক্তপাত ঘটানো হয় আর তার পরিবার-পরিজনকে লাঞ্ছিত করা হয়।

ইমাম হুসাইন রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! তাহলে আমি কোথায় যাবো? মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বললেন, তুমি মক্কায় অবস্থান করতে থাকো। সেখানে যদি শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করো তাহলে তো ভাল। নতুবা মরুভূমি কিংবা পাহাড়ি এলাকার দিকে চলে যেয়ো এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফর করতে থাকো। এভাবে জায়গা বদল করতে করতে খেয়াল রাখবে যে, দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। যাতে করে স্থায়ী একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারো। পরিস্থিতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে কাজ করা ভালো, সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর আফসোস করে কী লাভ? (আল-কামেল ৩/৩৭৯, তারীখে তাবারী ৩/২৭১, আল বিদায়া ৭-৮/১৫৫)

পথিমধ্যে ইমাম হুসাইনের রাযি.-এর সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মুতীর সাক্ষাত হল। অবস্থা জানার পর তিনি ইমামের কাছে আরয করলেন, হযরত! আপনি যদি মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার ইরাদা করে থাকেন তাহলে কুফায় মোটেও যাবেন না। সেটি বড়ই অমঙ্গলের শহর। আপনার পিতাকে সেখানেই শহীদ করা হয়েছে এবং আপনার ভাইয়ের উপর সেখানেই আততায়ীর হামলা হয়েছে এবং তাকে সহায় সম্বলহীনভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। বরং সম্ভব হলে আপনি হারাম শরীফ ছাড়বেন না। কেননা হেজাযবাসীরা আপনার বিপরীতে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেবে না। সেখানে অবস্থান করে আপনি আপনার সমর্থক আর কল্যাণকামীদেরকে সহজেই নিজের পাশে হাজির করতে পারবেন।

কুফাবাসীদের দাওয়াতী চিঠি

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. মক্কা পৌঁছে আবূ তালেবের ঘাঁটিতে অবস্থান নিলেন। মক্কার অধিবাসী এবং অন্যান্য এলাকার লোকজন যারা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেছিল তারা যখন হযরত ইমামের আগমনের সংবাদ অবহিত হল তখন দলেদলে তার খেদমতে হাজির হতে লাগল। এরা সর্বদা তাকে বেষ্টন করে থাকতো এবং নিজেদের আনুগত্য আর প্রাণ উৎসর্গের প্রমাণ রাখতে সচেষ্ট হতো। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. খানায়ে কাবার একপ্রান্তে অবস্থান করছিলেন। তিনি সারাদিন নামায আর তাওয়াফের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো ইমাম হুসাইনের রাযি.-এর নিকট এসে পরামর্শে শরীক হতেন।

কুফাবাসীরা প্রথম থেকেই আহলে বাইতের প্রতি সমর্থনের দাবীদার ছিল। তাদের কারণেই হযরত আলী রাযি. খিলাফতের রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেছিলেন। এটা ভিন্ন কথা যে, তাদের এই দাবী কখনো পরীক্ষার কষ্টিপাথরে টিকতে পারেনি। কুফাবাসীরা যখন হযরত মুআবিয়ার রাযি. মৃত্যু সংবাদ অবগত হল তখন উল্লসিত হয়ে উঠল। সুলাইমান ইবনে যরদ খুযাই তাদের সরদার ছিল। তার গৃহে গোপন পরামর্শ হল এবং সেখানে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইমাম হুসাইন রাযি.-কে কুফায় এনে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে খিলাফতকে আবারও আহলে বাইতের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। কারণ তারাই এর উপযুক্ত এবং ইয়াযীদ আদৌ এ পদের উপযুক্ত নয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুফার নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে প্রায় দেড়শত চিঠি হযরত ইমামের নামে প্রেরণ করা হল। সে সব চিঠির সারমর্ম ছিল এই– আল্লাহর পাকের শোকর যে, আপনার প্রতিপক্ষ চিরনিদ্রায় শায়িত। এখন আমরা ইমামবিহীন অবস্থায় আছি। আপনি দ্রুত তাশরীফ নিয়ে আসুন যাতে আপনার সাহায্যে আমরা সত্যের উপর একত্রিত হতে পারি। কুফার গভর্নর নুমান ইবনে বশীরের পিছনে আমরা জুমুআর নামাযও পড়ি না, ঈদের নামাযও পড়ি না। আমরা যদি অবগত হই যে, আপনি তাশরীফ নিয়ে আসছেন তাহলে আমরা তাকে সিরিয়ার সীমান্তে ঠেলে দেব। (ইবনে কাসীর ৪/১৬২)

এসব চিঠি পত্র ছাড়াও কুফার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইমাম হুসাইন রাযি.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাকে কুফায় যাওয়ার অনুরোধ করতে লাগল। (আল কামেল ৩/ ৩৮৫, তারীখে তবারী ৩/২৭৩, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/১৫৮)

মুসলিম ইবনে আকীলের কুফায় যাত্রা

অনুরোধের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হযরত হুসাইন রাযি. অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বীয় চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফায় প্রেরণ করলেন এবং কুফাবাসীর প্রেরিত চিঠিসমূহের জবাবে লিখলেন: আমি আপনাদের আগ্রহ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। আমি আপনাদের নিকট আমার ভাই এবং বিশ্বস্ত মুসলিম ইবনে আকীলকে পাঠাচ্ছি। তিনি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে আমাকে সংবাদ দেবেন। আমি যদি জানতে পারি যে, কুফার আম-খাছ, ছোট-বড় সকলেই আমাকে খলীফা বানানোর প্রত্যাশী তাহলে ইনশাআল্লাহ আর দেরি করব না। বাস্তব কথা হল, ঐ ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার যোগ্য যে আল্লাহর কিতাবের ধারক, ন্যায় বিচারক এবং সত্য দীনের অনুসারী।

যাহোক, মুসলিম ইবনে আকীল মদীনা হতে কুফায় পৌঁছলেন এবং মুখতারের গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। হযরত আলী রাযি.-এর ভক্তবৃন্দরা তাকে ঘিরে ধরল। তারা দলে দলে আসতে থাকতো আর মুসলিম ইবনে আকীল তাদেরকে হযরত হুসাইন রাযি.-এর চিঠি পড়ে শোনাতেন। চিঠি শোনে তারা কেঁদে কেঁদে অঙ্গীকার করতো যে, ইমাম হুসাইনের সহযোগিতার ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য আমরা প্রদর্শন করব না বরং তার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেবো।

নুমান ইবনে বশীর তখন হযরত মুআবিয়া কর্তৃক নিযুক্ত কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি সৎচরিত্রবান ও সন্ধি-প্রিয় ছিলেন। তিনি ঘটনার সবটুকুই জানতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতোটুকু করলেন যে, জামে মসজিদে বয়ান করতে গিয়ে বললেন– হে লোক সকল! তোমরা ফেৎনার দিকে ধাবিত হয়ো না। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না। এতে জান-মাল বরবাদ হবে। আমি অপবাদ আর কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে কাউকে কোন শাস্তি দিতে

চাই না তবে তোমরা যদি প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করো তাহলে আমিও কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না। তার এ বক্তব্যের পর বনু উমাইয়া তথা ইয়াযীদের সমর্থকদের একজন নুমানকে বাধা দিয়ে বলল, হে আমীর! আপনি দুর্বলতা প্রকাশ করছেন; এভাবে কাজ হবে না। কিন্তু নুমান জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে দুর্বল হওয়া তার নাফরমানীতে শক্তিশালী হওয়ার চেয়ে ভালো। অতঃপর এই বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি ইয়াযীদকে সব কিছু লিখে জানাল এবং এ কথাও বলল যে, কুফায় যদি নিজের শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাও তাহলে শক্ত কোন ব্যক্তিকে গভর্নর করে পাঠাও। নুমানের মত দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা এখানকার ফেতনা নির্মূল হবে না।

ইয়াযীদ সারজুন রুমীর পরামর্শ অনুযায়ী বসরার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করল এবং আদেশ দিল, কুফায় গিয়ে মুসলিম ইবনে আকীলকে সেখান থেকে বহিষ্কার অথবা হত্যা করবে।

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কুফায় গমন

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আপন ভাই উসমান ইবনে যিয়াদকে বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে কুফায় রওয়ানা হয়ে গেলো। সে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে কুফায় প্রবেশ করল। কুফার লোকেরা সে সময় ইমাম হুসাইনের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে দেখে মনে করল, হযরত হুসাইন রাযি. আগমন করেছেন। সুতরাং ইবনে যিয়াদ যে রাস্তা ও মহল্লাই পার হচ্ছিল সেখানেই মারহাবা হে রাসূল দৌহিত্র! শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছিল।

ইবনে যিয়াদ পরের দিন কুফার জামে মসজিদে এই বক্তৃতা দিল যে, আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ আমাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। আমাকে মজলুমদের সঙ্গে ইনসাফ আর অনুগতদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার এবং গাদ্দার ও অবাধ্যদের সঙ্গে কঠোরতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি এই নির্দেশ অবশ্যই পালন করব। বন্ধুদের সঙ্গে আমার ব্যবহার আপন ভাইয়ের মত হবে। আর বিরোধীদেরকে তরবারীর খোরাক বানানো হবে। সুতরাং প্রত্যেকেই যেন নিজের উপর দয়া করে।

অতঃপর সে হুকুম জারী করল, প্রতিটি মহল্লার দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার মহল্লায় বসবাসরত বহিরাগত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা যেন তার নিকট প্রেরণ করে। কোন মহল্লার দায়িত্বশীল যদি এই আদেশ পালনে শিথিলতা করে এবং উক্ত মহল্লার যদি কেউ রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় তাহলে মহল্লার দায়িত্বশীলকে তার বাড়ির দরজায় ফাঁসি দেওয়া হবে এবং মহল্লার সকল লোকদের ভাতা বন্ধ করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে।

হানীর গৃহে মুসলিম ইবনে আকীলের আশ্রয় লাভ

মুসলিম ইবনে আকীল যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আগমন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন মুখতারের গৃহ ত্যাগ করে হানী ইবনে উরওয়া মারবীর গৃহে আসলেন এবং সেখানে থাকার অনুমতি চাইলেন। হানী বললেন, আপনি আমাকে আমার শক্তি বহির্ভূত কাজে বাধ্য করছেন। কিন্তু আপনি যেহেতু আমার গৃহে প্রবেশ করেছেন তাই এখন অস্বীকার করার সুযোগ নেই। হানী তাকে মহিলাদের কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

হানীর গ্রেফতারী

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর সমর্থকগণ এবার হানীর গৃহে একত্রিত হতে শুরু করল। ইবনে যিয়াদ গুপ্তচরদের মাধ্যমে অবগত হয়ে হানীকে তলব করে বলল, হানী! আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে তোমার গৃহে ষড়যন্ত্র হচ্ছে! তুমি মুসলিম ইবনে আকীলকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছো আর তার জন্য জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের অপেক্ষা করছো। আবার এটাও মনে করছ যে, এসব বিষয়ে আমি অবগত নই! হানী দেখলেন অস্বীকার করে কোন লাভ নেই তাই তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীল আমার গৃহেই আছে। কিন্তু লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আশঙ্কায় তাকে ইবনে যিয়াদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার জানালেন। ইবনে যিয়াদ হানীর সঙ্গে কঠোরতা করল এবং তাকে নিজের ঘরে বন্দী করে রাখল।

গভর্নর-ভবন অবরোধ

মুসলিম ইবনে আকীল যখন স্বীয় মেজবানের বন্দী হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন, তিনি 'ইয়া মানসূর উম্মাহ' শ্লোগান লাগালেন। মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে ঐ সময় পর্যন্ত ১৮ হাজার মানুষ বাইআত হয়েছিল। তাদের মধ্যে চার হাজার লোক আশপাশের গৃহসমূহে অবস্থান করছিল। শ্লোগান শুনতেই তারা সকলে বাইরে বেরিয়ে এলো। মুসলিম ইবনে আকীল তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নর-ভবন ঘেরাও করলেন। সংবাদ পেয়ে অন্যরাও মুসলিম ইবনে আকীলের সাহায্যার্থে ছুটে আসলো। এমনকি জামে মসজিদ আর বাজার ইমাম হুসাইন রাযি.-এর সমর্থকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

মুসলিম ইবনে আকীলের গ্রেফতারী ও শাহাদাত

ইবনে যিয়াদের নিকট তখন পুলিশের ৩০জন লোক এবং শহরের গণ্যমান্য আর তার খানদানের ২০জন লোক উপস্থিত ছিল। ইবনে যিয়াদ শহরের গণ্যমান্য লোকদের বলল, আপনারা নিজ নিজ গোত্রের উপর প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে মুসলিমের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলুন। তারা বাইরে এসে স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করল। অতঃপর নিরাপত্তার পতাকা উড্ডয়ন করল। মুসলিম ইবনে আকীলের সঙ্গীরা তার থেকে পৃথক হতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে মাত্র ত্রিশজন লোক রয়ে গেল। মুসলিম ইবনে আকীল এই অবস্থা দেখে আশ্রয়ের জন্য কিনদাহ মহল্লার দিকে ছুটে চললেন। মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন। রাত ছিল অন্ধকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। কোথায় মাথা গুজবেন এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

একটি ঘরের দরজায় একজন বৃদ্ধাকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে তিনি তাকে নিজের মুসীবতের উপাখ্যান শোনালেন। বৃদ্ধার মনে দয়ার উদ্রেক হল। বৃদ্ধা নিজ গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে তাকে লুকিয়ে রাখলেন। ইবনে যিয়াদ ইশার নামাযের পর জামে মসজিদে ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি মুসলিম ইবনে আকীলকে আশ্রয় দেবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে ধরিয়ে দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। অতঃপর সে পুলিশকে কুফার সকল ঘর-বাড়ি তন্নতন্ন করে তালাশ করার নির্দেশ দিল। বৃদ্ধার ছেলে প্রাণের ভয়ে সরকারী লোকদেরকে সংবাদ দিয়ে দিল। ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে গ্রেফতারের জন্য মুহাম্মদ ইবনে আশআসকে পাঠাল। ইবনে আশআস মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থানস্থল ঘিরে ফেলল। মুসলিম যখন জানতে পারলেন, দুশমন মাথার উপর দণ্ডায়মান অথচ তিনি একা আর তার মোকাবিলায় ৭০জন তবুও তিনি দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করলেন এবং কাউকে নিকটে ঘেঁষতে দিলেন না। পরিশেষে মুহম্মদ ইবনে আশআস বলল, আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের আশ্রয়ে আসতে পারেন। আপনি তো আমাদের পর নন। মুসলিম ইবনে আকীল আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিলেন, বাধ্য হয়ে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আশআসের নিকট নিজেকে সঁপে দিলেন। রাস্তায় তিনি ইবনে আশআসকে বললেন, আমার মনে হয় তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। তবে আমার একটা দরখাস্ত আছে তুমি সেটা অবশ্যই

গ্রহণ কর। ইবনে আশআস জিজ্ঞেস করল সেটা কী? মুসলিম বললেন, কাউকে পাঠিয়ে আমার অবস্থা সম্বন্ধে ভাই হুসাইনকে জানিয়ে দিও। আর আমার পক্ষ থেকে তাকে বলে দিও, তিনি যেন কুফাবাসীদের ধোঁকায় না পড়েন। এরা তো তারাই যাদের হাত থেকে মুক্তির আশা তার পিতা সব সময় করতেন। হুসাইনকে আরো বলে দিও, তিনি যেন পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কায় ফিরে যান। মুহাম্মদ ইবনে আশআস ওয়াদা করল যে, এই পয়গাম সে ইমামের নিকট পৌঁছে দেবে। অতঃপর সে তার এই ওয়াদা রক্ষা করেছিল। (আল-কামেল ৩/৩৮৭-৩৮৯, ৩৯৮)

মুসলিম ইবনে আকীলকে ইবনে যিয়াদের সামনে আনা হলো। ইবনে যিয়াদ তিরস্কার করলে তিনিও কঠোরভাবে প্রতিউত্তর দিলেন। অবশেষে ইবনে যিয়াদ তাকে শহীদ করে দিল। (ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মুসলিম ইবনে আকীলকে শহীদ করার পর ইবনে যিয়াদ হানী ইবনে উরওয়াকে হত্যার আদেশ দিল। শহরে হানীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে মুহাম্মদ ইবনে আশআস তার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কোন কথা গ্রাহ্য না করে হানীকেও শহীদ করে দিল।

ইবনে যিয়াদ উভয় শহীদের মাথা ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দিল। ইয়াযীদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখে পাঠাল, আমি জানতে পারলাম হুসাইন ইরাকের পথে যাত্রা শুরু করেছে, তুমি কঠোর পাহারাদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করো। কারো পক্ষ থেকে সামান্য সন্দেহ প্রকাশ পেলে তাকে গ্রেফতার করবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তোমার মোকাবিলায় তরবারী না ওঠায় তুমিও তার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করবে না।

হযরত হুসাইন রাযি.-এর কুফায় যাওয়ার সংকল্প এবং সহমর্মীদের নসীহত

মুসলিম ইবনে আকীল যখন কুফায় পৌঁছেছিলেন তখন হযরত হুসাইন রাযি.-এর পক্ষে ১৮ হাজার মানুষ তার হাতে বাইআত করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হযরত হুসাইন রাযি.-কে লিখে জানিয়েছিলেন যে, আপনি নিশ্চিন্তে তাশরীফ নিয়ে আসতে পারেন। ইরাকবাসীরা আপনার সমর্থক এবং বনু উমাইয়ার তথা ইয়াযীদের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কুফা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। তার কল্যাণকামীরা যখন এ বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তারা ইমাম হুসাইনকে কুফায় গমন থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। উমর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারস বললেন, আমি জানতে পারলাম আপনি ইরাক যাওয়ার মনস্থ করেছেন। অথচ সেখানকার সরকারী কর্মকর্তারা বনু উমাইয়ার সমর্থক। সেখানকার ধনভাণ্ডারও তাদের কবজায়। জনসাধারণের উপরও ভরসা করা যায় না; তারা তো ঘর-সংসারের গোলাম। আমার আশংকা হয়, যেসব লোক আপনাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে তারাই কাল আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করবে। হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, ভাই! তোমার কথা মানি আর না মানি তুমি যে সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, হে চাচাতো ভাই! লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে, তুমি নাকি ইরাক যাচ্ছো। আল্লাহর ওয়াস্তে এরকম ইচ্ছা মোটেও করো না। ইরাকবাসীরা কি বনু উমাইয়ার শাসকদেরকে বহিষ্কার করে সে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে? যদি এরকম হয় তাহলে অবশ্যই যাও। কিন্তু অবস্থা যদি এই হয় যে, তাদের শাসকরা এখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ধনভাণ্ডারের চাবি তাদেরই হাতে তাহলে কুফাবাসীরা তোমাকে এই জন্য ডাকছে যে, তারা তোমাকে যুদ্ধের আগুনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা পৃথক হয়ে যাবে। এই আচরণ তারা তোমার পিতা আর ভাইয়ের সঙ্গেও করেছে। হযরত হুসাইন রাযি. উত্তরে বললেন, আমি ইস্তিখারা করে দেখব।

দ্বিতীয় দিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. আবার এসে বললেন, চাচার বেটা! আপনি কুফার ধারে-কাছেও যাবেন না। কুফাবাসীরা বিশ্বাসঘাতক। আপনি মক্কায় অবস্থান করে আপনার হাতে বাইআতের আহবান জানান। আপনি হেজাযবাসীদের সরদার, তারা আপনার কথা গ্রহণ করবে। আর যদি মক্কা থেকে চলে যেতেই চান তাহলে ইয়ামানের দিকে যান। এটি একটি বিশাল রাজ্য, সেখানে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে, আর আপনার পিতার হিতাকাঙ্ক্ষীরাও সেখানে বিদ্যমান আছেন। সেখানে অবস্থান করে ইসলামী প্রদেশসমূহে স্বীয় খিলাফতের পয়গাম পৌঁছে দিন। আমি আশা করি, আপনি সফলকাম হবেন। ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, ভাই! তোমার স্নেহশীল হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তো ইরাকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, এই সিদ্ধান্ত যদি চূড়ান্ত হয়ে থাকে তাহলে অন্তত নারী ও শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। আমার আশংকা হয়, হযরত উসমান রাযি.-এর মত আপনাকেও না নারী ও শিশুদের সামনে মাটি আর রক্তের মধ্যে তড়পাতে হয়!

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. যখন জানতে পারলেন তিনিও ইমামকে বুঝিয়ে বললেন যে, আপনি হারাম শরীফে অবস্থান করে বিভিন্ন এলাকায় নিজ খিলাফতের দাওয়াত দিন। আর ইরাকের সমর্থকদেরকে লিখুন তারা যেন এখানে এসে আপনার সাহায্য করে, আমিও আপনার সাহায্যের জন্য উপস্থিত থাকব। হারাম শরীফ এমনিতেও ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা এখানে আসা যাওয়া করতে থাকে। সুতরাং এখানে অবস্থান করা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু হযরত হুসাইন রাযি. জবাব দিলেন আমি পিতার নিকট শুনেছি যে, হারাম শরীফের একটি মেষ হারাম শরীফের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করার কারণ হবে, আমি সেই মেষ বনতে চাই না। (আল কামেল ৩/৩৯৯-৪০১)

কুফার পথে ইমাম হুসাইন রাযি.

পরিশেষে ৬০ হিজরীর ৮ যিলহজ্জ ইমাম হুসাইন রাযি. পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে কুফার পথে রওয়ানা হলেন। সাফফাহ নামক স্থানে পৌঁছে তার সাক্ষাত হল বিখ্যাত ইসলামী কবি ফারাযদাকের সঙ্গে, যিনি তখন ইরাক থেকে ফিরছিলেন। ইমাম হুসাইন রাযি. তার নিকট ইরাকের অবস্থা জানতে চাইলেন। ফারাযদাক বললেন, ইরাকবাসীদের অন্তর আপনার সঙ্গে কিন্তু তাদের তরবারী বনু উমাইয়ার সঙ্গে, আর ফায়সালা তো আল্লাহর হাতে। হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, তুমি সত্য বলেছো। আল্লাহর ফায়সালা যদি আমাদের মর্জিমত হয় তাহলে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করব। আর যদি মৃত্যু আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাহলেও কোন অসুবিধা নাই, কেননা আমাদের নিয়ত ভালো।

আরো কিছু দূর গিয়ে তাঁর সাক্ষাত হল স্বীয় চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সঙ্গে। তিনিও অত্যন্ত জোরালোভাবে ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন। বললেন, আমার আশংকা হয়, না-জানি এই রাস্তায় আপনার প্রাণ-সংহার হয় আর আপনার পরিবারের উপর ধ্বংস নেমে আসে! তিনি মদীনার গভর্নর উমর ইবনে সাঈদের নিকট হতে হযরত হুসাইন রাযি.-এর নামে একটি নিরাপত্তাপত্রও লিখিয়ে এনেছিলেন। তিনি

ইমাম হুসাইনকে নাছোড়বান্দা হয়ে বাধা প্রদান করলেন। তার হাত থেকে বাঁচার জন্য ইমাম হুসাইন রাযি. নিজের স্বপ্ন শোনাতে বাধ্য হলেন যে, আমি নানাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমাকে নিয়ে ইফতার করবেন। সুতরাং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে। অতঃপর ইমাম হুসাইন রাযি. নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন।

সা'লাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন। এ সময় কয়েকজন সঙ্গী তাকে বললেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, ফিরে চলুন; কুফায় আপনার কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের আত্মীয়-স্বজনরা বলল, আমরা ফিরে যাবো না। হয়তো মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যার বদলা নেবো, অথবা আমাদের জানও দিয়ে দেবো। একথা শুনে হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, এদেরকে পরিত্যাগ করে জীবনের কোন স্বাদ নেই।

যাবালা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি স্বীয় দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবনে বাকতারের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন। হযরত হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে বাকতারকে একটি চিঠি দিয়ে মুসলিম ইবনে আকীলের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে বাকতার যখন চিঠি নিয়ে পৌঁছলেন ততক্ষণে মুসলিমের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। ইবনে যিয়াদ তাকেও ভবনের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে শহীদ করে দিল।

এসব সংবাদ দ্বারা তিনি কুফার অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারলেন। তিনি স্বীয় সাথীদেরকে বললেন, কুফাবাসী আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন আশা নেই। সুতরাং আমার যেসব সাথী ফিরে যেতে ইচ্ছুক তারা খুশিমনে ফিরে যেতে পারে; আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি আছে। এই ঘোষণা শুনে তার বেশির ভাগ সাথী ইমাম হুসাইন রাযি.-কে ছেড়ে নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরে গেল। শুধু তার পরিবারের সদস্যবর্গ এবং বিশেষ কয়েকজন প্রাণ-উৎসর্গকারী সঙ্গী রয়ে গেল।

ইমাম হুসাইন রাযি.-কে বাধা প্রদান

ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইন রাযি.-এর যাত্রার সংবাদ অবগত হয়েছিল। তাই সে ইয়াযীদের নির্দেশমতো মক্কা-মদীনা থেকে ইরাক অভিমুখী সকল রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমীকে এক হাজারের বাহিনী দিয়ে হযরত হুসাইনের সন্ধানে এবং তাকে ঘিরে ফেলার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। হযরত হুসাইন রাযি. যখন হাশাম নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন হুর ইবনে ইয়াযীদও তার সন্ধান করতে করতে সেখানে উপস্থিত হল এবং তার মুখোমুখি তাঁবু স্থাপন করল। ইমাম হুসাইন রাযি. স্বীয় সাথীদেরকে হুকুম দিলেন, ওদেরকে পানি পান করাও আর ওদের ঘোড়াগুলোরও তৃষ্ণা নিবারণ করো; এরা ঠিক দুপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

যোহরের নামাযের সময় হলে ইমাম হুসাইন রাযি. হুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করবে নাকি পৃথক পড়বে? হুর বলল, একসঙ্গেই পড়ব। সুতরাং উভয় বাহিনী একত্রে ইমাম হুসাইনের পেছনে নামায আদায় করল। নামায শেষে ইমাম হুসাইন রাযি. হুরের সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন, লোক সকল! আমি তোমাদের আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছি। তোমরা চিঠি লিখেছো এবং দূত পাঠিয়েছো যে, আপনি এখানে আগমন করে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তোমরা যদি এখনও তোমাদের কথার উপর অটল থাকার ওয়াদা করো তাহলে আমি তোমাদের শহরে যাবো, আর যদি আমার আগমন তোমাদের অপছন্দনীয় হয় তাহলে নিজ দেশে ফিরে যাবো।

হুর বলল, আপনি চিঠি আর দূত পাঠানোর কথা কী বলছেন? আমরা তো এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এবার ইমাম হুসাইন রাযি. দু'টি ঝোলা থেকে চিঠির স্তূপ বের করে কুফাবাসীর সামনে রাখলেন। হুর বলল, যাই হোক আমরা এসব চিঠি লিখিনি। আমাদেরকে তো আপনাকে গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের সামনে হাজির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, এটা তো অসম্ভব। অতঃপর তিনি সাথীদেরকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। হুর বাধা দিয়ে বলল, আমি আপনাকে ফিরে যেতে দেব না; তবে আপনার সঙ্গে লড়াইও করব না। সবচেয়ে ভাল হয়, আপনি যদি ইরাক আর হেজাযের মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করেন। আমি ইবনে যিয়াদকে লিখে পাঠাচ্ছি আপনিও ইয়াযীদকে লিখুন। হতে পারে এমন কোন সুরত পয়দা হয়ে যাবে, যাতে আমাকে আপনার মোকাবিলায় দাঁড়াতে না হয়। ইমাম হুসাইন রাযি. এই প্রস্তাব কবুল করলেন এবং উত্তর দিকে নিনওয়ার পথ ধরলেন। হুরও পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

আযিবুল মিহজানাতে পৌঁছে ইমাম হুসাইন রাযি. তুরমাহ ইবনে আদীর সাক্ষাৎ পেলেন। তুরমাহ বলল, কুফায় আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জোর প্রস্তুতি চলছে। এত বড় বাহিনী আমি কখনও ময়দানে জমা হতে দেখিনি। আমার পরামর্শ হল, আপনি বনু তাই গোত্রের প্রসিদ্ধ পাহাড় আজা'য় চলে যান। সেখানে গাসসানী আর হিময়ার গোত্রের শাসকরাও কখনো সুবিধা করতে পারেনি। আপনি যদি সেখানে তাশরীফ নিয়ে যান তাহলে বনু তাই গোত্রের ২০ হাজার যুবকের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব, যাদের তরবারী আপনার সাহায্যার্থে কোষমুক্ত হবে। কিন্তু হযরত হুসাইন রাযি. শুকরিয়ার সঙ্গে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, হুরের সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে আমি তা ভঙ্গ করব না। নিনওয়া পৌঁছার পর হুর ইবনে যিয়াদের পত্র পেল, যাতে লেখা ছিল হুসাইন এবং তার সাথীদেরকে এক্ষুণি বাধা দাও এবং তাদেরকে এমন জায়গায় নামতে বাধ্য করো যেখানে কোন আড়াল নেই, পানিও নেই। হুর ইমাম হুসাইনকে এই চিঠি দেখাল। তিনি বললেন, আরো কিছুদূর যেতে দাও, তারপর আমরা নেমে পড়ব। হুর রাজি হলো। অতঃপর যখন তিনি কারবালা ময়দানে পৌঁছলেন তখন হুর রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলল, এবার আর সামনে অগ্রসর হতে দেব না, এখানেই নেমে পড়ুন । দরিয়ায়ে ফুরাতও এখান থেকে নিকটে। ইমাম হুসাইন এবং তার সাথীগণ ৬১ হিজরীর ২রা মুহররম কারবালা ময়দানে অবতরণ করলেন। (আল কামেল ৩/৪০৭-১১)

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর কারবালায় অবস্থান

কারবালায় অবতরণের পরের দিন উমর ইবনে সাদ চার হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। উমর ইবনে সাদকে ইবনে যিয়াদ রায় এবং সীমান্ত শহর দাইলামের শাসক নিযুক্ত করেছিল। সে স্বীয় এলাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় ইমাম হুসাইন রাযি.-এর যাত্রার সংবাদ আসে। ইবনে যিয়াদ তাকে ইমাম হুসাইন রাযি.-কে প্রতিহত করার নির্দেশ দেয়। উমর ইবনে সাদ অপারগতা প্রকাশ করে। তখন ইবনে যিয়াদ তাকে বলল, এই দায়িত্ব পালন করতে যদি দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয়

আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী দা.বা. (মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ)

ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম দেওবন্দ-এর স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস ও মুহতামিম, মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী ছাহেব দা.বা. গত ১৫/০৪/২০২২ ঈ. তারিখে মদনপুরা, বেনারস, ইউপির মসজিদে বেলাল-এ রমাযানুল মুবারকের দ্বিতীয় জুমু'আয় হিন্দুস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। বয়ানটি হিন্দুস্তানের বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত হলেও বর্তমান প্রতিকূল বিশ্বপরিস্থিতিতে সকল মুসলমানের জন্য দিকনির্দেশকের ভূমিকা রাখবে। হযরতের স্নেহভাজন শাগরেদ মাওলানা উবায়ের আহমাদ ছাবেরীর মাধ্যমে হযরতের অনুমতিক্রমে রাবেতার পাঠক-সমীপে এর অনুবাদ পেশ করা হলো। –সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর...

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আজ রমাযানুল মুবারকের দ্বিতীয় জুমু'আ। এই জুমু'আয় সাধারণত যাকাতের মাসাইল এবং শবে-কদর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আর এ বিষয়ক মাসাইল প্রায় সময় আমাদের সামনে আলোচিত হতে থাকে। তাই আজ আমি এ বিষয়ে আলোচনা না করে মুসলিম উম্মাহ, বিশেষত হিন্দুস্তানের মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতি সামনে রেখে কিছু আলোচনা পেশ করতে চাচ্ছি।

হিন্দুস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তা তো আপনাদের সামনে স্পষ্ট। মুসলমান, ইসলাম এবং ইসলামী শি'আর তথা প্রতীকগুলোর গণ্ডি দিনদিন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। পরিস্থিতি খুবই নাযুক হতে চলেছে। আগে ঝগড়া-ফাসাদ হতো, কিছু দোকানপাট পোড়ানো হতো, ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হতো, কিছু লোকের প্রাণ খোয়া যেতো, অতঃপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। কিন্তু বর্তমানে শরয়ী বিধি-বিধান এবং ইসলামী শি'আর-এর উপরও আক্রমণ শুরু হয়েছে। পর্দার বিধান, প্রকাশ্যে জুমু'আর নামায আদায় এবং মাইকে আযান দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে। এমনিভাবে একের পর এক শরয়ী বিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে এবং পরিস্থিতিকে বিষাক্ত ও উত্তপ্ত করার বিরামহীন অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

চলমান পরিস্থিতিতে 'দ্যা কাশ্মীর ফাইলস' নামে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের সম্পর্কে একটি ফিল্ম তৈরি করে সারা বিশ্বকে দেখানো হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য, মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। এই পরিস্থিতি নিয়মিত চলছে। এমন নয় যে, এ সম্পর্কে লোকেরা অবগত নয় কিংবা এ বিষয়ে তাদের কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু হচ্ছে কি! যাদেরকে জ্ঞানী বলা হচ্ছে বা যারা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান মনে করছেন তাদের দ্বারা শুধু নেতৃবৃন্দকে অভিশাপ দেয়া ছাড়া কিছুই হচ্ছে না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়:

সাধারণ মুসলমানদের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করা উচিত এ বিষয়ে কারো পক্ষ থেকে যথার্থ আলোচনা করা হচ্ছে না। আজ আমি এ বিষয়েই আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করতে চাই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের যিম্মাদারী ও করণীয় কী? আমি সর্বপ্রথম নিজেকে, নিজের পরিবারকে, বন্ধু-বান্ধবকে, মহল্লাবাসীকে, শহর-বাসীকে এবং সারা বিশ্বের যে সকল লোকের নিকট এই কথা পৌঁছতে পারে, তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছি– আমার মতে আমাদের করণীয় তিনটি–

প্রথম কাজঃ

আমাদের প্রথম কাজ হলো নিজের ঈমান-আমল মজবুত করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

(ভাবানুবাদ) আর তোমরা নিজেদেরকে দুর্বল মনে করো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও, ঈমানওয়ালা হও, তোমাদের ঈমান মজবুত হয় এবং ঈমানের চাহিদা অনুযায়ী আমল করতে থাকো, তাহলে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে, মাথা উঁচু করে থাকবে। (সূরা আলে ইমরান-১৩৯)

আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য; কোন স্থান-কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا .

(ভাবানুবাদ) তোমরা কখনো আল্লাহ তা'আলার আইন-কানূনে, রীতি-নীতিতে পরিবর্তন দেখতে পাবে না। তিনি যা কানূন করেন, তা সর্বদার জন্য প্রযোজ্য। (সূরা আহযাব-৬২, সূরা ফাতির-৪৩)

সুতরাং আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো দুর্বল ও ভীতু না হয়ে দিলকে মজবুত করা। মৃত্যু একবারই আসবে এবং নির্ধারিত সময়েই আসবে– এটাই আমাদের ঈমান-আকীদা। ঈমানের বুনিয়াদী বিষয়সমূহের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, যখন বান্দা জন্ম নেয় তখন আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বয়স নিয়েই দুনিয়াতে আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

(অর্থ:) যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় চলে আসে, তখন না এক মুহূর্ত আগে আসতে পারে, আর না এক মুহূর্ত পরে আসতে পারে। (সূরা আরাফ-৩৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

(অর্থ:) যদি তোমরা সুউচ্চ, সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যেও অবস্থান করো তবুও মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। (সূরা নিসা-৭৮)

সুতরাং মৃত্যু তো আসবেই, প্রত্যেকের জন্যই আসবে, সময়মতই আসবে এবং একবারই আসবে। এজন্য মৃত্যুর ভয়ে সবসময় ভীতু হয়ে থাকা, নিজেকে দুর্বল করে রাখা এটা ঈমানী চেতনার পরিপন্থী। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা তো এমন ছিল যে, তাঁরা বর্শাবিদ্ধ হলেও বলতেন– فزتُ ورب الكعبة (অর্থ:) 'কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি।' (সহীহ বুখারী; হাদীস ৪০৯১)

অতএব দিল মজবুত রাখতে হবে এবং আমাদের যা করণীয় তা করতে হবে। সর্বপ্রথম কাজ তো হলো, নিজের আমল সংশোধন করব, উত্তম আখলাক-চরিত্র গঠন করব, বাইরের এবং ভেতরের যিন্দেগীকে তাকওয়াওয়ালা বানাব। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থেকে নিজেকে বাঁচাব, নামাযের প্রতি শতভাগ গুরুত্ব দিব। আর এটা রমাযানেও করব,

রমাযানের বাইরেও করব। আমাদের যে চারিত্রিক দুর্বলতা, খারাবী ও বদ-আমল রয়েছে তা থেকে তাওবা করব। নিজেকে বাঁচাব, নিজের পরিবারবর্গকে, সন্তানাদিকে, মহিলাদেরকে এবং যুবকদেরকেও বিরত রাখব। নিজেদের পরিবেশ থেকে মন্দ ও খারাবীকে দূরীভূত করার চেষ্টা করব। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাকওয়া, ঈমান ও সবরের উপর নিহিত। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ

(ভাবানুবাদ) যে তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহকে ভয় পায় এবং দীনের উপর জমে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্য করেন। (সূরা ইউসুফ-৯০)

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা তাকওয়া ও সবরের ভিত্তিতেই ছিল। সুতরাং নিজেদের আমল সংশোধন করব, উত্তম আখলাক গঠন করব।

দ্বিতীয় কাজ:

আমাদের দ্বিতীয় কাজ হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের যে চিত্র অমুসলিমদের পক্ষ হতে দুনিয়াবাসীর নিকট প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে তা হলো, মুসলমানরা যালেম, অত্যাচারী, চরমপন্থী, সংঘাতপ্রিয়, দুশ্চরিত্র, খুনী ও হত্যাকারী। অথচ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত চিত্র সেটাই যা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন এবং যার উপর সাহাবায়ে-কেরাম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের প্রকৃত চিত্র হলো, আমরা শান্তিপ্রিয়, অভাবী-অনাহারী ও বিপদগ্রস্তের সাহায্যকারী, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী এবং মানবতার ভিত্তিতে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। নিজেদের আমল দ্বারা আমাদেরকে এগুলো প্রমাণ করে দেখাতে হবে। অন্যদের তথ্যসন্ত্রাস, মিথ্যা অপপ্রচার এবং বিকৃত ফিল্মের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জালেম, অত্যাচারী এবং খুনী হওয়ার যে পরিকল্পিত চিত্র মানুষের দিলে এঁকে দেয়া হচ্ছে, তা বয়ানের মাধ্যমে দূর হবে না; আমলের মাধ্যমে দূর করতে হবে। আপনারা দেখেছেন, গত দু'বছর পূর্বে লক-ডাউনের সময় যে কঠিন পরিস্থিতি এসেছিল, খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছিল তখন মুসলমানরা নিজেদের ইসলামী আখলাকের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং যে উদারতা ও সহমর্মিতার পরিচয় দিয়েছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপরও তার প্রভাব পড়েছে। এমনিভাবে আমাদের দেশের ভিন্নধর্মী যে সকল লোক মুসলমানদের ঘৃণা করত, এর প্রভাবে তাদের মধ্যেও অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল এবং নৈতিকভাবে তারাও একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, ভাই! আমরা মুসলমানদের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতাম তা ভুল ছিল। এটা কেন হয়েছে? এজন্য হয়েছে যে, তখন ইসলামী আখলাক দেখানো হয়েছে, ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ দেখানো হয়েছে। সুতরাং এটা যেন সর্বদা আমাদের যিন্দেগীতে বিদ্যমান থাকে। আমরা ঘৃণার প্রত্যুত্তর ঘৃণার মাধ্যমে দেয়ার পরিবর্তে মহব্বতের মাধ্যমে দিব, তাহলে এর সুপ্রভাব অবশ্যই পড়বে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় কাজ:

তারা যা করছে, রাজনীতিবিদরা এ ব্যাপারে অবগত আছেন। তবে আমাদের পয়গাম, মহব্বতের পয়গাম। যতদূর পর্যন্ত মহব্বতের পয়গাম পৌঁছানো সম্ভব, আমাদের পৌঁছানো উচিত। আমরা অন্যদের উপর ভরসা করব না। যে পরিস্থিতি চলছে, তা তো আপনারা দেখছেন, এর বিরুদ্ধে না কোনো রাজনৈতিক পার্টি আওয়াজ তুলছে, না কোনো রাজনৈতিক লিডার সামনে আসছে। আমাদের যা কিছু করার, তা নিজেদের বাহুবল এবং ঈমানী শক্তির ভিত্তিতেই করতে হবে। এজন্য নিজেদের আমলসমূহ সংশোধন করতে হবে, অন্তরে হিম্মত ও সাহস যোগাতে হবে।

অন্তরে দুর্বলতা আসে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতির কারণে :

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পরিস্থিতির কারণে অন্তরে যে দুর্বলতা ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে তা কীভাবে দূর হবে? প্রিয় ভাইয়েরা! একটি হাদীস মনে পড়ে গেলো। তা হলো, যেখান থেকে এবং যে পথ দিয়ে এই দুর্বলতা এসেছে ঐ পথ দিয়েই তা দূর করতে হবে। আরেকটি হাদীস রয়েছে, যা হয়তো পূর্বেও আপনারা শুনেছেন, এটি বর্তমান পরিস্থিতির সাথে বেশ সঙ্গতিপূণ–

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

(ভাবানুবাদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! এমন সময় আসবে যখন সকল জাতি তোমাদের বিপক্ষে একে অপরকে এমনভাবে ডাকবে, যেমন দস্তরখানে খানা খাওয়ার জামা'আত একে অপরকে ডাকতে থাকে যে, আসো, এই পাত্রের খানা খুব সুস্বাদু, এই তরকারি খুব মজাদার, এটাও একটু নাও। এমনিভাবে তোমরা সুস্বাদু-শিকারে পরিণত হয়ে যাবে এবং সমস্ত জাতি তোমাদের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে খতম করার চেষ্টা করবে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, তখন সাহাবায়ে-কেরামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল, অবস্থা ছিল খুবই অনুকূলে, একমাসের দূরত্বেও ছিল তাদের শৌর্য-বীর্যের প্রতাপ। এজন্য তাঁরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কি এমন হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন– بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِير না, বরং তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক থাকবে– وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতের উপর ভাসমান খড়কুটোর মতো। পানির উপর এ পরিমাণ খড়কুটো থাকে যে, পুরো পানি তা দ্বারা ঢেকে যায়। কিন্তু না তার কোনো মূল্য আছে, আর না আছে কোনো শক্তি। খড়কুটো স্রোত থেকে নিজেকে আগলে রাখতে পারে না, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। পানির স্রোত তাকে যে দিকে নিয়ে যায়, সে দিকেই সে চলতে থাকে। কোথাও কোনো বস্তু আসলে তার সঙ্গে লেগে থাকে, আবার নিচুভূমি আসলে পতনের শিকার হয়। তোমাদের অবস্থাও এমনই হবে যে, তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, কিন্তু স্রোতের পানিতে ভাসমান খড়কুটোর যে অবস্থা হয়, তোমাদেরও সেই অবস্থা হবে। শুনুন! মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখুন! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বর্তমান যামানা সম্পর্কে বলেছেন। যে পরিস্থিতি এসেছে, এটা কোত্থেকে এসেছে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভয় বের করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে ভীতি ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিবেন। কোত্থেকে এই ফায়সালা হচ্ছে? উপর থেকে হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই ভীতি কোত্থেকে আসবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, দু'টি কারণে এমন হবে– حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ তথা: দুনিয়াপ্রীতি ও

মৃত্যুভীতি। (সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ৪২৯৭)

দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতিকে খতম করতে হবে, শুধু পরিস্থিতির অভিযোগ করলে কিছুই হবে না:

এই দু'টি কারণ অন্তরে ভীতি তৈরি করে, দুর্বলতা সৃষ্টি করে। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, যে সকল কারণে অন্তরে ভীতি ও দুর্বলতা আসে, তার চিকিৎসা হলো ঐ কারণসমূহকে খতম করতে হবে এবং সেগুলোকে দূর করতে হবে। এজন্যই আমি বলেছি, দু'টি কাজ করতে হবে–

এক. মৃত্যুকে ভয় করা তথা মৃত্যুর ভয়ে এই আতঙ্কে ভুগতে থাকা যে, না-জানি কি হয়ে যায়? না-জানি কি ঘটে যায়? এই ভীতি ছাড়তে হবে। আরে ভাই! তাকদীরে যা লেখা আছে, তা তো ঘটবেই। যখন লেখা আছে, তখনই ঘটবে; আগেও ঘটবে না, পরেও ঘটবে না। কিন্তু সেই ভয়ে আমরা কি নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিব? হাত-পা বেঁধে বসে থাকব? এটা তো মুমিনের কাজ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুর প্রতি অনীহা দিল থেকে বের করে দাও, মৃত্যুর ভয় অন্তর থেকে মুছে ফেলো।

দুই. তারপর বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বত। দুনিয়ার মহব্বত কী? দুনিয়ার মহব্বত এই যে, ঘুম আমাদের নিকট প্রিয়, নামায প্রিয় নয়। আমরা সুদ খাই, মিথ্যা বলি, অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, খিয়ানত করি, ওয়ারিসদের হক নষ্ট করি, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেই, ঈমানের বিপরীত কাজ করি। কেন আমরা এগুলো করি? সামান্য দু'চার পয়সার লোভে, একটু আনন্দ-ফূর্তির জন্য, একটু আরাম-আয়েশের জন্য। হ্যাঁ, এটাই দুনিয়ার মহব্বত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(ভাবানুবাদ) হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলে দিন– যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের পরিবার-পরিজন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বদা যার মন্দার ভয় করো, তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা কামাই করে রেখেছ, তোমাদের ঘর-বাড়ি যা তোমরা খুব পছন্দ কর, এগুলো তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি প্রিয় হয়ে যায় এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, কুরবানী পেশ করা অপেক্ষাও বেশি প্রিয় হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। (সূরা তাওবা-২৪)

এ সকল বিষয় কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আমার ভাইয়েরা! এজন্য শুধু পরিস্থিতির অভিযোগ করলে কিছুই হবে না। নিজের মধ্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করতে হবে এবং যে পথ দিয়ে এই দুর্বলতা এসেছে সেই পথ বন্ধ করতে হবে।

পরীক্ষা আসবেই, তাতে অটল থাকতে হবে, সবর করতে হবে:

মনে রাখতে হবে, কারো সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার আত্মীয়তা নেই। তাঁর দরবারে তো ফায়সালা হবে কেবল ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে। তবে হ্যাঁ, ঈমানদারদের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সাহাবায়ে কেরামকেও এ ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা গাযওয়ায়ে উহুদে, গাযওয়ায়ে হুনায়নে এ ধরণের পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নন, পূর্বের অন্যান্য নবী-রাসূলগণও এ জাতীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে তার বর্ণনা রয়েছে–

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ.

(ভাবানুবাদ) আর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-দুর্দশা এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যে, তারা ভীত-প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, তারা একথা বলা শুরু করেছিল যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب শুনে রাখো, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সন্নিকটে। (সূরা বাকারা-২১৪)

বোঝা গেলো, তাঁরা প্রকম্পিত হয়েছেন, অভাব-অনটন এবং ভয়-ভীতির মাধ্যমে পরীক্ষার শিকার হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

(ভাবানুবাদ) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। কোন জিনিসের পরীক্ষা? مِنَ الْخَوْفِ কিছু ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে وَالْجُوعِ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মাধ্যমে وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে وَالْأَنْفُسِ প্রাণনাশের মাধ্যমে وَالثَّمَرَاتِ এবং ফল-ফসল বিনষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর এ সকল পরীক্ষা আসবে। কিন্তু এগুলোর পরীক্ষা যে হবে তা কেন হবে? এটা দেখার জন্য যে, কে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, আর কে অকৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর যে অকৃতকার্য হবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ এ সকল পরীক্ষায় তারাই কৃতকার্য হবে, যারা অটল-অবিচল থাকবে, সবর ও ধৈর্যের সাথে থাকবে। (সূরা বাকারা-১৫৬)

সবর-এর উদ্দেশ্য, প্রকারসমূহ ও তার পুরস্কার:

সবর-এর অর্থ শুধু বালা-মুসীবত বরদাশত করা নয়; বরং বালা-মুসীবত হোক বা শান্তি, সর্বদা দীনের উপর অবিচল থাকা, সকল ইবাদত সুষ্ঠুভাবে পালন করা, সব ধরনের গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা, আর যে অবস্থারই সম্মুখীন হোক না কেন, সেটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে মনে করে তা মেনে নেয়া, অভিযোগ না করা, এটা হলো সবরের সমষ্টিগত অর্থ। ইবাদতের জন্য সবর, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সবর, বালা-মুসীবতে সবর, যেখানে সবরের এই তিন প্রকার পাওয়া যাবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ হে নবী! ঐ সকল সবরকারীর জন্য সুসংবাদ দিন যাদের নীতি হলো–

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(অর্থ:) তাদের উপর যখন কোনো বালা-মুসীবত আসে তখন বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যই, আর আল্লাহর নিকটই আমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করব। (সূরা বাকারা-১৫৬)

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

(অর্থ:) তারা ঐ সকল লোক, যাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ষিত হয় বিশেষ রহমত এবং সাধারণ রহমতেও তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অংশ। আর তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। (সূরা বাকারা-১৫৭)

নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, দু'আর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে বিশেষত শেষ রাত্রিতে:

প্রিয় ভাইয়েরা! এটা খোলা রাস্তা, সুতরাং সর্বপ্রথম নিজের আমলসমূহকে সংশোধন করব। কোলাহল এবং নির্জনতার যিন্দেগীকে পরিশুদ্ধ রাখব। নির্জনতায় বসে বসে গুনাহ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখব। নিজের মন ও মস্তিষ্ককে গোনাহ থেকে পবিত্র করব। ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনাকে নোংরামী থেকে মুক্ত রাখব। মসজিদগুলো আবাদ করব। আল্লাহকে স্মরণ করব, আল্লাহর যিকির করব, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত

করব, তাসবীহ পাঠ করব এবং দু'আর প্রতি গুরুত্ব দিব।

আমি পরিশেষে দু'আর কথা বললাম, কেননা শুধু কুনূতে-নাযেলা পড়ার দ্বারা, শুধু কুরআনে কারীম খতম করার দ্বারা, শুধু হিসনে-হাসীন পড়ে দু'আ করার দ্বারা পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে না; পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে নিজেদেরকে পরিবর্তন করার দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা আজ পর্যন্ত ঐ জাতির পরিস্থিতির পরিবর্তন করেননি, যাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করার খেয়ালই আসেনি। আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করব, তো সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শুধু দু'আ করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে না। আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা আমল-আখলাকের ভিত্তিতে হয়। ঠিক আছে নিজেকে পরিবর্তন করব, দু'আও করব, কিন্তু দু'আ করার পূর্বে আমাদেরকে আরও কিছু করতে হবে; শুধু দু'আকে যথেষ্ট মনে করব না। রমাযানুল মুবারক মাসের মধ্যবর্তী দশক চলছে, আখেরী দশক সামনে আসছে, তাতে দু'আ করব। বিশেষ করে শেষ রাতে উঠে দু'আ করব, যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঘোষণা করা হয়–

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرله؟

(ভাবানুবাদ) রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে ডেকে বলতে থাকেন, আছে কোনো আহ্বানকারী? যার আহ্বানে আমি সাড়া দেবো। আছে কোনো যাচনাকারী? যাকে আমি দান করব। আছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? যাকে আমি ক্ষমা করব। (সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ১৩১৫)

এভাবে ফজর পর্যন্ত এক-এক প্রয়োজন নিয়ে ঘোষণা হতে থাকে।

আল্লাহর তরফ থেকে এই আওয়াজ আসতে থাকে, যদিও আমরা তা শুনতে পাই না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঐ সকল আওয়াজের সাথে পরিচিত করেছেন। রমাযানের সকল রাতই মূল্যবান, শেষ দশকের রাতগুলো বিশেষত বিজোড় রাতগুলো, যা বছরে মাত্র একবার আসে, তাও এসে গেছে। প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা এই সময়ের কদর করব, মূল্যায়ন করব, রাতে উঠে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করব, কাকুতি-মিনতি করব, খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করব, যিন্দেগীতে পরিবর্তন আনার ফায়সালা করিয়ে নিব।

প্রিয় ভাইয়েরা! আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো–

এক. নিজের আমল-আখলাক সংশোধন করব, গুনাহ থেকে তাওবা করব, নতুনভাবে যিন্দেগী শুরু করব।

দুই. স্বদেশী-ভাই ও প্রতিবেশীদের সামনে ইসলামী আখলাক ও সহানুভূতির ঐ চিত্র পেশ করব, যা মুসলমানদের প্রকৃত চিত্র এবং যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। যাতে তাদের মন-মস্তিষ্ক যে নোংরামী এবং বিষ দিয়ে পূর্ণ করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তার আমলী প্রত্যুত্তর হয়ে যায়।

তিন. দিলকে মজবুত রাখব, দিল থেকে ভয়-ভীতি ঝেড়ে ফেলব, মৃত্যুর ভয় অন্তর থেকে দূর করব। মৃত্যু সত্য, সময়মত আসবে, স্রেফ একবার আসবে, কেউ মৃত্যুকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে আমরা ঘরে বসে কাঁপতে থাকব, এটা সঠিক পন্থা নয়।

শেষ নিবেদন:

শরীয়ত এবং রাষ্ট্রীয়-আইন আমাদেরকে আত্মরক্ষার অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ না করুন, যদি এমন পরিস্থিতি এসে যায় যে, আমাদের জান-মালের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায় তাহলে আমরা ভীতুর মতো ঘরে বসে থাকব না। আমরা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। নিজেদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা পরিপন্থী কোনো কাজ করব না। কিন্তু যদি আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর উপর কেউ হামলা করে তাহলে ছাদে চড়ে শুধু নারায়ে-তাকবীর বলব না; বরং আল্লাহ তা'আলা যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন, হিম্মত দিয়েছেন এবং আসবাব-সামগ্রী যতটুকু প্রস্তুত থাকে তা নিয়েই আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত। পরিশেষে বলব, মৃত্যু যদি আসে তাহলে যেন সম্মানের সাথে আসে। মৃত্যু তো সময়মতই আসবে কিন্তু কাপুরুষের মত অন্তরে দুর্বলতা ও ভয়-ভীতি নিয়ে নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দেয়া ঈমানদারদের শান নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন, সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আ-মী-ন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অনুবাদ: মীযানুর রহমান বিন সাঈদ
শিক্ষার্থী: ইফতা ২য় বর্ষ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর

(৮ পৃষ্ঠার পর)

কারবালার সঠিক ইতিহাস

তাহলে তুমি রায় আর দাইলামের কর্তৃত্বও পাবে না। উমর ইবনে সাদ শাসন ক্ষমতার লোভে এই আদেশ পালন করতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সে ইমাম হুসাইন রাযি.-এর সঙ্গে লড়াই করতে চাচ্ছিল না। এজন্য শেষ সময় পর্যন্ত সে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

উমর ইবনে সাদ ইমাম হুসাইন রাযি.-এর নিকট দূত পাঠিয়ে জানতে চাইল, আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছেন? ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, ১৮ হাজার কুফাবাসীর পক্ষ হতে আমাকে চিঠি লেখা হয়েছিল যে, আমাদের কোন ইমাম নেই, আপনি তাশরীফ নিয়ে আসুন, আমরা আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করব। আমি তাদের চিঠির উপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়েছি। পরে কুফাবাসী আমার হাতে বাইআত করেও তা ভঙ্গ করেছে এবং আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি এটা অবগত হয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইলাম কিন্তু হুর ইবনে ইয়াযীদ আমাকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি। এখন তুমি তো আমার নিকটাত্মীয়, আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি মদীনায় চলে যাবো।

উমর ইবনে সাদ এই জবাব শুনে বলল, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর শপথ! আমি নিজেও চাই যে হুসাইনের রক্তে আমার হাত যেন রঞ্জিত না হয়। অতঃপর সে ইবনে যিয়াদকে ইমাম হুসাইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করল। ইবনে যিয়াদ উত্তরে লিখল, আগে হুসাইনের নিকট থেকে ইয়াযীদের বাইআত গ্রহণ করো, এর পরে আমরা অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করবো। যদি সে বাইআতে রাজি না হয় তাহলে তার পানি বন্ধ করে দাও।

পানি বন্ধ করে দেয়া হল

ইমাম হুসাইন রাযি. কোনক্রমেই ইয়াযীদের হাতে বাইআত করতে সম্মত হননি। সুতরাং মুহাররমের ৭ তারিখ উমর ইবনে সাদ ইমাম হুসাইন রাযি. এবং তার সাথীদের পানি বন্ধ করে দিল এবং ফুরাতের তীরে ৫০০ সৈন্য মোতায়েন করল। ইমাম হুসাইন রাযি. স্বীয় বাহাদুর ভাই আব্বাস ইবনে আলীকে পানি সংগ্রহ করে আনতে বললেন। তিনি ত্রিশজন অশ্বারোহী আর বিশটি মশক নিয়ে পানি আনতে গেলেন এবং জোর করে পানি নিয়ে এলেন। (আল-কামেল ৩/৪১২)

মহিমান্বিত শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনা

উমর ইবনে সাদ ইমাম হুসাইন রাযি.-এর সঙ্গে লড়াই করতে চাচ্ছিল না। তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যেন সন্ধির কোন সুরত পয়দা হয়ে যায় আর তার তরবারী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোকদের রক্তে রঞ্জিত না হয়। তাই সে যুদ্ধের ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগল এবং ইমাম হুসাইনের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করতে লাগল। একরাতে হযরত হুসাইন রাযি. এবং উমর ইবনে সাদ উভয় বাহিনীর মাঝামাঝি স্থানে একত্রিত হলেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করতে লাগলেন। ইমাম হুসাইন রাযি. উমর ইবনে সাদকে বললেন, আমরা উভয়ে আমাদের বাহিনীকে এখানে রেখে সরাসরি ইয়াযীদের নিকট গিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করি। উমর ইবনে সাদ বলল, তাহলে ইবনে যিয়াদ আমার ঘর বিরান করে ফেলবে। ইমাম হুসাইন বললেন, তাহলে আমাকে আমার দেশে ফিরে যেতে দাও অথবা অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়ার সুযোগ দাও, পরে অবস্থা যা হওয়ার হবে। কিন্তু ইবনে সাদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেও অপারগতা প্রকাশ করল।

পাঠক! বাস্তব কথা হচ্ছে উভয়ের আলোচনার ব্যাপারে যা কিছু বলা হল তা অনুমাননির্ভর। কেননা ইবনে সাদ আর ইমাম হুসাইন রাযি.-এর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা ছিল একান্ত গোপনীয় এবং সেখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। তবুও প্রকৃত ব্যাপার হল, ইবনে সাদ এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধানকল্পে তৃতীয় একটি পথ পেয়ে গেল এবং নিজস্ব মতামত সম্পর্কে ইবনে যিয়াদকে অবহিত করল। ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইন রাযি. এবং ইবনে সাদের আলোচনার রিপোর্ট নিয়মিত অবহিত হচ্ছিল। তার আশংকা হলো, ইবনে সাদ আবার না ইমাম হুসাইনের সঙ্গে মিলে যায় এবং সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। সুতরাং সে শিম্র ইবনে যিল-জওশানের পরামর্শে ইবনে সাদকে লিখল, আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাইনি যে, তুমি হুসাইনের মোকাবিলা থেকে পিঠ বাঁচাতে থাকবে আর তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে থাকবে বা যুদ্ধ প্রলম্বিত করতে থাকবে কিংবা তার ব্যাপারে কোন সুপারিশ নিয়ে আমার নিকট আসবে। হুসাইন যদি নিঃশর্ত আনুগত্য কবুল করে তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আর যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যুদ্ধ করে তাকে কতল করে দাও। এই হুকুম পালনে তোমার যদি কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে আমি শিম্র ইবনে যিল-জওশানকে পাঠাচ্ছি। তুমি সৈন্যবাহিনী তাকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজেকে অপসারিত মনে করো। ইবনে যিয়াদের এই ধমকির পরে উমর ইবনে সাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল এবং তার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিল। এটি হল ৯ মুহাররম সন্ধ্যাবেলার ঘটনা।

ইমাম হুসাইন রাযি. সংবাদ অবগত হয়ে এক রাতের অবকাশ চাইলেন। উমর ইবনে সাদ অবকাশ দিল। এ সময় হযরত হুসাইন রাযি.-এর দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, সত্যের পথে এবার তাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। শত্রুরা তার রক্তে পিপাসা নিবারণ না করে শান্ত হবে না। তিনি সকল সাথীকে একত্র করে ইরশাদ করলেন– আমি আমার সাথীদের চাইতে অধিক অনুগত ও সৎচরিত্রবান কাউকে দেখিনি এবং নিজ পরিবারবর্গের চাইতে অধিক নেককার ও আত্মীয়তা রক্ষাকারীও কাউকে পাইনি। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আগামীকাল আমার আর দুশমনদের আখেরী ফয়সালার দিন। তারা শুধু আমাকেই চায়। তাই আমি তোমাদের সকলকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। আমার সাথীরা আমার পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই যেন চলে যায় এবং নিজ নিজ শহরে পৌঁছে উত্তম যুগের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তার অনুগত আর জীবন উৎসর্গকারী সাথীরা একবাক্যে বলে উঠল, আপনার পরে আমরাই বা জীবিত থেকে কী করব! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেন সেদিনের জন্য জীবিত না রাখেন! এই উত্তর শুনে ইমাম হুসাইন রাযি. চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন এবং আহলে বাইতের সদস্যদেরকে ওসিয়ত করতে লাগলেন।

তাঁর ভগ্নি যয়নব বিনতে আলী খুব অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলে তিনি বললেন, বোন! সবর করো। দেখো, আসমান-যমীনের সকল অধিবাসীই ধ্বংসশীল; শুধু আল্লাহ তা'আলার সত্তাই চিরস্থায়ী। আমাদের এবং প্রতিটি মুসলমানের রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করা উচিৎ। হে বোন, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, সত্যপথে অবিচল থেকে আমি যদি সফলকাম হতে পারি তাহলে তুমি আমার শোকে জামা ছিঁড়ে, চেহারা খামচে মাতম করো না। (ইবনে আসীর ৪/২৪) এসব ব্যবস্থা থেকে অবসর হয়ে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং রাতভর দু'আ-মুনাজাতের মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। তার সাথীরাও সারারাত নামায, ইস্তিগফার আর কাকুতি-মিনতির মধ্যে কাটিয়ে দিল। (আল কামেল ৩/৪১৭)।

শাহাদাতের সকাল

পরিশেষে আশুরা দিবসের সকালের উন্মেষ ঘটল। সূর্য রক্ত-অশ্রু ছড়াতে ছড়াতে উদিত হল। হযরত হুসাইন রাযি. ফজরের নামায শেষে জীবন উৎসর্গকারী ৭২জন সাথী নিয়ে রণাঙ্গনে এলেন। ডান দিকে যুবায়ের ইবনে কিন, বাম দিকে হাবীব ইবনে মুজাহেরকে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর আব্বাস ইবনে আলীর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে ইমাম হুসাইন রাযি. স্বয়ং ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন এবং কুরআন শরীফ আনিয়ে সামনে রাখলেন এবং দু-হাত তুলে দু'আ করলেন।

তিনি যদিও খুব ভালোভাবে জানতেন যে, তার কোন চেষ্টা বাহ্যিকভাবে সফলকাম হবে না তবুও দলীলের পূর্ণতার জন্য কুফাবাসীদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন, যাতে কুফাবাসী আল্লাহর দরবারে কোন ওজর পেশ করতে না পারে। তিনি বললেন, হে লোক সকল! একটু থামো। আমার কথা শ্রবণ করো, যেন আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শ্রবণ করো আর আমার সঙ্গে ন্যায়বিচার করো তাহলে তোমাদের চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে তোমরা যদি এর জন্য প্রস্তুত না থাকো তাহলে সেটা তোমাদের ইচ্ছা, ঘটনার সব দিক তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমাদের যা ইচ্ছা তা করার অধিকার রাখবে। আমার সঙ্গে কোন কিছু করতে বাদ রাখবে না, আমার সাহায্যকারী আমার আল্লাহ।

হযরত হুসাইন রাযি. এটুকু বলতে না বলতেই মহিলাদের তাঁবু থেকে কান্নার রোল ভেসে আসলো। তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ঠিকই বলেছিল; মহিলাদেরকে সঙ্গে না আনাই ভালো ছিল। অতঃপর তিনি আব্বাস ইবনে আলীকে মহিলাদেরকে চুপ করানোর জন্য পাঠালেন। তারা নিশ্চুপ হয়ে গেলে তিনি আবার বক্তৃতায় ফিরে এসে বললেন, হে লোকেরা! একটু চিন্তা করে দেখো আমি কে? তারপর ভেবে দেখো তোমাদের জন্য আমাকে হত্যা করা এবং আমাকে লাঞ্ছিত করা জায়েয আছে কিনা? আমি কি তোমাদের নবীর দৌহিত্র

নই? আমি কি তার চাচাতো ভাই আলীর পুত্র নই? সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি. কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না? শহীদ জাফর তাইয়ার কি আমার চাচা ছিলেন না? আমাদের দুই ভাই সম্পর্কে তোমরা কি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদীস শোননি যে, 'হে হাসান, হুসাইন! তোমরা জান্নাতের সরদার, আর আহলে সুন্নাতের চোখের শীতলতা।' আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, অথচ আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি, তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী এখনো জীবিত আছেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো। তা-সত্ত্বেও কি তোমরা আমার রক্তপাত থেকে বিরত হবে না? নবীজীর এই হাদীসের ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? অথবা এই ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে যে, আমি ফাতেমাতুয যাহরার ছেলে হুসাইন? এতে যদি সন্দিহান হও তাহলে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে, তোমরা পূর্ব-পশ্চিমে আমি ব্যতীত আর কাউকে নবী-দৌহিত্র রূপে আর ফাতেমার আদরের দুলাল হিসাবে পাবে না। তোমরা আমাকে কেন হত্যা করতে চাও? আমি কি তোমাদের কাউকে হত্যা করেছি? তোমাদের কারো ধন-সম্পদ ডাকাতি করেছি? তোমাদের কাউকে আহত করেছি?

অতঃপর তিনি কুফার কয়েকজন নেতার নাম ধরে বললেন, হে অমুক, অমুক! তোমরা কি পত্র প্রেরণ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানাওনি?

তারা বলল, না, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইনি। হযরত হুসাইন বললেন, তোমরা অবশ্যই আমন্ত্রণ জানিয়েছো। তবে এখন আমার আগমন যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে দাও।

এ সময় এক ব্যক্তি বলল, আপনি আমার চাচাত ভাই ইবনে যিয়াদের সিদ্ধান্ত কেন মেনে নিচ্ছেন না? এটাই তো আপনার জন্য ভালো।

হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ছোটলোকদের মতো আমার হাত দুশমনের হাতে দিতে পারি না। গোলামের মত তাদের দাসত্ব মেনে নিতে পারি না। আমি সকল অহংকারী থেকে– যাদের কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস নেই– আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করছি। (আল কামেল ৩/৪১৮-১০)

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর পদতলে হুর ইবনে ইয়াযীদ

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর এই ভাষণ কুফাবাসীর উপর কোন প্রভাব ফেলল না। তবে হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমী ধীরে ধীরে ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়াকে সজোরে হাঁকিয়ে আহলে বাইতের বাহিনীতে যোগ দিলেন। তিনি ইমাম হুসাইন রাযি.-কে বললেন, হে রাসূলের বংশধর! আমিই ঐ নরাধম যে সর্বপ্রথম আপনাকে বাধা দিয়েছি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, আমার সম্প্রদায় বদবখতীর চরমসীমায় পৌঁছে যাবে এবং যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত পন্থা অবলম্বন করবে না। এখন আমি আপনার পদতলে হাজির; শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে আপনার সাহচর্যের হক আদায় করব। আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আমার এই ভূমিকা কি পেছনের গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হবে? হযরত হুসাইন রাযি. খুশি হয়ে বললেন অবশ্যই হে হুর! দুনিয়াতেও তুমি হুর (স্বাধীনচেতা) আখেরাতেও ইনশাআল্লাহ দোযখের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। হুর এবার স্বীয় কওমকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! ইমাম হুসাইন রাযি.-এর প্রস্তাবগুলোর যে কোন একটি মেনে নাও এবং তার বিরুদ্ধে তরবারীধারণের অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করো।

উমর ইবনে সাদ বলল, আমি তো সমঝোতাই পছন্দ করি কিন্তু এটি তো আমার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। অতঃপর কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হল এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। (আল কামেল ৩/৪২১)

জান্নাতের সরদার হযরত হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাত

প্রথমে মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষ থেকে এক-একজন করে ময়দানে আসতো আর প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতো। কিন্তু এভাবে কুফাবাসীদের প্রচুর ক্ষতি হল। আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়ের কালবী, বারীর ইবনে হাসীর, হুর ইবনে ইয়াযীদ এবং নাফে ইবনে হেলাল নিজেদের প্রতিপক্ষকে কচুকাটা করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে শত্রুবাহিনী থেকে উমর ইবনে হাজ্জাজ যুবাইদী চিৎকার করে বলল, হে বাহাদুরগণ! তোমরা কি জানো কাদের সঙ্গে লড়াই করছো? এরা তো তারা যারা নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে বের হয়েছে। তাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ মোটেই সমীচীন নয়; বরং সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করো। এরা কজনই বা সংখ্যায়? খোদার কসম! তোমরা এদের উপর পাথর নিক্ষেপ করলেও এদের কেউ বাঁচবে না।

এবার ব্যাপকভাবে লড়াই শুরু হলো। স্বল্পসংখ্যক আহলে বাইতের জীবন উৎসর্গকারীরা অগণিত কুফাবাসীর যম হিসাবে আবির্ভূত হলো। হুসাইনী বাহিনীর বীরযোদ্ধারা যেদিকে ফিরতো শত্রু বাহিনীর ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো। কিন্তু যুদ্ধ ছিল অসম; একদিকে অগণিত সেনা, অপরদিকে মাত্র ৭২ জন। দুপুর হতে হতে হযরত হুসাইন রাযি.-এর সকল সাথী একে একে শহীদ হয়ে গেলেন। এবার রয়ে গেলেন আহলে বাইতের যুবকবৃন্দ। আকবর ইবনে হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে আকীল, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, কাসেম ইবনে হুসাইন ইবনে আলী, আবূ বকর ইবনে হুসাইন ইবনে আলী নিজ নিজ তরবারীর ঝলক দেখাতে দেখাতে জান্নাতী যুবকদের সরদারের জন্য জান কুরবান করে দিলেন। পরিশেষে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি.এর সঙ্গে তার চার ভাই আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জাফর ও উসমান ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। যতক্ষণ পর্যন্ত বুকে দম থাকল তারা প্রতিটি আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন। অবশেষে এক-এক করে তারাও জান্নাতের পথে পাড়ি জমালেন । ইমাম হুসাইন রাযি. এখন নিঃসঙ্গ, একা। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। পিপাসায় কাতর। কিন্তু তার বীরত্ব উৎসাহ আর উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়ল না। যেদিকেই তার তরবারী উঠতো শত্রুর অগণিত লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এভাবে নিশ্চুপ বসে থাকলেন। কিন্তু দুশমন তার উপর হামলা করতে সাহস পেল না। তার রক্তে নিজের ভাগ্যকে কলঙ্কিত করা থেকে সকলে বাঁচতে চাচ্ছিল। পরিশেষে চরম পাপিষ্ঠ শিমর চিৎকার করে বলল, তোমরা কিসের অপেক্ষা করছো? তাকে হত্যা করছো না কেন?

হযরত হুসাইন রাযি. তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠে কেবল পানির পাত্রটি লাগিয়েছিলেন এমন সময় হুসাইন ইবনে তামীম নামক এক নরাধম তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি তার কণ্ঠনালীতে এসে বিদ্ধ হল। তিনি টলতে টলতে ফুরাতের দিকে চললেন। শত্রুবাহিনী তার উপর চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উরওয়া ইবনে শুরাইক তামীমী তার উপর তরবারীর আঘাত করল আর সিনান ইবনে আনাস নাখঈ বর্শার আঘাতে তাকে যমিনে শায়িত করে ফেলল এবং তরবারী দিয়ে মস্তক মুবারক দ্বিখণ্ডিত করে দিল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আখবারুত তিওয়াল ২৫৫, আল কামেল ৩/৪৩০)

তার পবিত্র শরীরে ৩৩টি বর্শার আঘাত আর ৩৩টি তরবারীর আঘাত ছিল। এছাড়া অগণিত তীরের আঘাত তো ছিলই। (আল কামেল ৩/৪৩২)

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের পর পাপিষ্ঠরা আহলে বাইতের মহিলাদের তাঁবুর দিকে ধাবিত হল। মাল-সামানা যা কিছু ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে নিলো। এমনকি মহিলাদের গায়ের চাদর পর্যন্ত খুলে নিলো। হযরত হুসাইন রাযি.-এর দুই পুত্র যাইনুল আবেদীন ও আলী আসগর অসুস্থতার কারণে তাঁবুতে শায়িত ছিলেন। শিমর তাদেরকেও শহীদ করতে চাইল, কিন্তু উমর ইবনে সাদ বলল, মহিলাদের তাঁবুতে প্রবেশ কোরো না, বাচ্চাদের গায়ে হাত উঠিও না।

মহিমান্বিত শাহাদাতের এই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ৬১ হিজরী সনের ১০ মুহাররম রোজ শুক্রবার সংঘটিত হলো। পরের দিন গাযেরিয়ার অধিবাসীরা জানাযার নামায আদায় করে শহীদদেরকে কারবালার ময়দানেই দাফন করলো। হযরত হুসাইন রাযি.-সহ অন্যান্য শহীদদের মাথা যেহেতু দুশমনরা কেটে নিয়ে গিয়েছিল তাই মাথাবিহীন শরীর দাফন করা হলো। আল্লাহ তা'আলা শুহাদায়ে কারবালার সকলের উপর রহম করুন এবং তাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম নসীব করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর স্বপ্ন:

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি একবার দ্বিপ্রহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। তাঁকে অত্যধিক চিন্তান্বিত ও বিষণ্ন মনে হচ্ছিল। কাদামাখা অবস্থায় তিনি পেরেশান হয়ে ছুটে আসছিলেন। তাঁর হাতে রক্তে পরিপূর্ণ একটি বোতল দেখা যাচ্ছিল। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই সময়ে এই করুণ অবস্থায় আপনি কোথা থেকে আসছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আমি কি করে মদীনায় শুয়ে থাকতে পারি! আজ আমার কলিজার টুকরো হুসাইনকে কারবালার ময়দানে জালিম ইয়াযীদ-বাহিনী শহীদ করে ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষ্ট করেছে। আমি আমার কলিজার টুকরোর শাহাদাতের মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য দর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাতে এটা কী? তিনি বললেন, এটি একটি বোতল! এতে কারবালার ময়দান থেকে কিছু রক্ত সংগ্রহ করে এনেছি। কিয়ামতের ময়দানে এ রক্ত পেশ করে আমি এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবো।

এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সকলকে হযরত হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর কিছু দিন পর যখন হযরত হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছল, হিসাব করে দেখা গেলো, তিনি যেদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিক সে দিনই হযরত হুসাইন রাযি. শাহাদাত বরণ করেছিলেন। (শহীদে কারবালা [উর্দূ] ৯৭, আল-কামেল ৩য় খণ্ড)

আহলে বাইতের কাফেলা সিরিয়ায়

এই হৃদয় বিদারক ঘটনার পর আহলে বাইতের সদস্যদেরকে কুফায় ইবনে যিয়াদের নিকট পাঠানো হলো, আর শহীদদের মাথা তার সম্মুখে পেশ করা হলো। ইবনে যিয়াদ হযরত হুসাইন রাযি.-এর দাঁত মুবারক একটি লাঠি দ্বারা খোঁচা দিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.। তিনি এই বেয়াদবী সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিজের চোখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঠোঁটে চুম্বন করতে দেখেছি; এর সঙ্গে বেয়াদবী করো না। একথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ বলল, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তোমার বোধশক্তি যদি লোপ না পেতো তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. বদ দু'আ করতে করতে মজলিস থেকে চলে গেলেন।

ইবনে যিয়াদ আহলে বাইতের এই কাফেলা এবং শহীদের মাথা শিমরের তত্ত্বাবধানে দামেশকে ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দিল। ইয়াযীদের দরবারে যখন হযরত হুসাইন রাযি.-এর মাথা মুবারক রাখা হলো আর পুরস্কারের লোভে শিমর নিজের এবং সাথীদের বীরত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল তখন ইয়াযীদ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, আফসোস তোমাদের উপর! তোমরা যদি হুসাইনকে হত্যা না করতে তাহলে আমি তোমাদের প্রতি অধিক খুশি হতাম। আল্লাহর লানত হোক ইবনে মারজানার (ইবনে যিয়াদের) উপর। তার স্থলে যদি আমি হতাম তাহলে আল্লাহর কসম আমি হুসাইনকে মাফ করে দিতাম। আল্লাহ! তুমি তাদের উপর রহমত নাযিল করো। এদিকে ইয়াযীদের স্ত্রী হিন্দ বিনতে আব্দুল্লাহ বিন আমের মুখে চাদর পেঁচিয়ে দরবারে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন! এটি কি রাসূলের কলিজার টুকরো হুসাইন ইবনে ফাতেমার মাথা? ইয়াযীদ জবাব দিল, হ্যাঁ এটা রাসূল দৌহিত্র হুসাইনের মাথা। তুমি এর জন্য মাতম করো। আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুন, সে তাকে হত্যার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। তবে ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদকে শাস্তিও দিল না কিংবা কুফার শাসনক্ষমতা থেকে বরখাস্তও করল না। এটা তার চরম অযোগ্যতা ও এই হত্যাকাণ্ডে সমর্থনের প্রমাণ।

অতঃপর ইয়াযীদ দরবারী লোকদেরকে সম্বোধন করে বলল, তোমরা কি জানো এই ঘটনা কেন ঘটল? হুসাইন বলেছিল, আমার পিতা হযরত আলী রাযি. ইয়াযীদের পিতার চেয়ে উত্তম। আমার মাতা সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা রাযি. ইয়াযীদের মাতার চেয়ে উত্তম। আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াযীদের নানার চেয়ে উত্তম। আর আমি নিজেও তার চেয়ে উত্তম, তাই খিলাফতের হকও আমারই বেশি।

পিতার ব্যাপারে কথা হলো, আমার পিতা আর তার পিতা আল্লাহর সামনে নিজেদের মুআমালা পেশ করেছিলেন। দুনিয়া স্বাক্ষী যে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার পক্ষে ফয়সালা করেছেন। (উল্লেখ্য, ইয়াযীদের এ বক্তব্য ভুল ছিল, কারণ রাজত্ব পাওয়া আর উত্তম হওয়া কখনো এক জিনিস নয়।) তবে তার মা রাসূল তনয়া ফাতেমা রাযি. আমার মায়ের চেয়ে উত্তম আর তার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নানার চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে কখনো কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ বলতে পারে না। তবে হুসাইন বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেনি এবং কুরআনের এই আয়াতের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি, যেখানে বলা হয়েছে– (অর্থ:) বলুন! হে আল্লাহ! তুমিই সারা জগতের বাদশাহ, যাকে ইচ্ছা তুমি বাদশাহী দান করো আর যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নাও। (আল কামেল ৩/৪৩৮)

আল্লাহই ভাল জানেন ইয়াযীদের এসব কথা তার অন্তরের প্রতিধ্বনি ছিল নাকি শুধু মাত্র চাপাবাজি ছিল। আর তার এই

অশ্রু দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অশ্রু ছিল নাকি রাজনৈতিক কূটকৌশল ছিল। কেননা ইতিহাসে এ ধরনের অশ্রুপাতের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরাও তাকে কূপে নিক্ষেপ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরে ফিরে এসে পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট বানোয়াট দুঃখ প্রকাশ করেছিল। পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে ইয়াযীদের এসব কর্মকাণ্ড তার রাজনৈতিক চাল ছিল; অন্তরের প্রতিধ্বনি ছিল না। বস্তুত ইয়াযীদ শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর অনেকগুলো মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। ইসলামী ইতিহাসে এর দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। যেহেতু নিছক দোষচর্চা আমাদের উদ্দেশ্য নয় তাই তার দুষ্কর্মের ফিরিস্তি পেশ করা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। ঘটনা বুঝানোর স্বার্থে দু'-একটি বিষয় বলতে বাধ্য হচ্ছি। ইমাম হুসাইন রাযি.-এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা ছিল ইয়াযীদের সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। তেমনিভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে শাস্তির সম্মুখীন না করাও ছিল তার বিরাট পদস্খলন। প্রকৃত কথা হলো, ইবনে যিয়াদ যা করেছিল ইয়াযীদেরই নির্দেশ বা ইশারায় করেছিল। আল্লাহ ইয়াযীদকে তার প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিন। আ-মীন।

আহলে বাইতের সদস্যবর্গের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাদের জন্য নিজ অন্দরমহলে থাকার ব্যবস্থা করলো। উভয় বংশের মধ্যে যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তাই ইয়াযীদ-বংশীয় মহিলাগণ তাদের নিকট এসে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে লাগল এবং তাদের দুঃখে শরীক হতে লাগল। ইয়াযীদ উভয় বেলা খানার সময় হযরত যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইনকে শাহী দস্তরখানায় নিজের সঙ্গে বসাতো। কয়েকদিন যত্নখাতিরের সঙ্গে মেহমানদারী করানোর পর ইয়াযীদ আহলে বাইতের কাফেলাকে কিছু মাল-সামান দিয়ে একজন বিশ্বস্ত ও সৎচরিত্র ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দিল। বিদায়ের প্রাক্কালে ইয়াযীদ যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইনকে বলল, আল্লাহ তা'আলার যা ফয়সালা ছিল তাই হয়েছে এবং এটা আমার মর্জির খেলাফ হয়েছে। যদি অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদের স্থলে আমি হতাম তাহলে কখনই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। বরং হুসাইন আমার সামনে যে প্রস্তাব দিতো আমি তা-ই কবুল করে নিতাম এবং তার প্রাণ এভাবে সংহার হতে দিতাম না। বৎস! তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে লিখে জানাবে। (ইবনে আসীর ৪/৩৬)

হযরত হুসাইন রাযি.-এর কন্যা হযরত সাকীনা রহ. ইয়াযীদের এই আলোচনায় বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, খোদাদ্রোহীদের মধ্যে আমি ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার চাইতে উত্তম কাউকে দেখিনি। ইয়াযীদের এসব কথার বাস্তবতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এই সবই ছিল তার রাজনৈতিক কূটকৌশল।

ইমাম হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতে জড়িতদের পরিণাম

ফুরাতের কূলে পানি পান করতে গিয়ে তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হযরত হুসাইন রাযি. আল্লাহর দরবারে এই বলে মুনাজাত করেছিলেন– "হে প্রতিপালক! তোমার রাসূলের আদরের দৌহিত্রের সঙ্গে আজ যারা এই অমানবিক আচরণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমি শুধু তোমার দরবারেই নালিশ পেশ করছি। এদের এক-একজন করে তুমি ধ্বংস করে দিও; কাউকে রেহাই দিও না।"

মজলুমের আহাজারি কবুল হতে বিলম্ব হয় না। তদুপরি নবীদৌহিত্রের পবিত্র মুখ দিয়ে যে বদদু'আ উচ্চারিত হয়েছে তা কবুল না হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে, দুনিয়ার বুকেই জালেমগুলো কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে এবং আখেরাতের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বেই ভীষণ কষ্টদায়ক আযাবের মুখোমুখি হয়েছে।

হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত একটা লোকও আল্লাহর কঠিন পাকড়াও থেকে দুনিয়াতেই নিস্তার পায়নি এবং এ ঘটনার পর ইয়াযীদও একদিনের জন্য শান্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেনি। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র শহীদানে কারবালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল এবং বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। হযরত হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের পর এই কঠিন বিদ্রোহের মধ্যে ইয়াযীদ মাত্র দুই বৎসর আট মাস মতান্তরে তিন বৎসর আট মাস শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিল এবং নিতান্তই লাঞ্ছিত অবস্থায় তাকে এই দিনগুলো অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আর এই লাঞ্ছিত অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেছিলেন।

(১) ইমাম যুহরী রহ. বলেন, যে সকল লোক হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের একজনও এমন ছিল না, দুনিয়াতে যার শাস্তি হয়নি। কাউকে হত্যা করা হয়, কারো চেহারা কুৎসিত হয়ে যায়, আর কিছুদিনের মধ্যেই কারও রাজত্ব কেড়ে নেয়া হয় এবং এটাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এগুলো তাদের কৃতকর্মের আসল শাস্তি নয় বরং নমুনা মাত্র, যা মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতেই দেখানো হয়েছিল।

(২) সাবেত ইবনে যাওযী রহ. বর্ণনা করেছেন, এক বৃদ্ধলোক হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। লোকটি হঠাৎ অন্ধ হয়ে যায়। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি জামার আস্তিন গুটিয়ে আছেন। তার হাতে রয়েছে একটি তলোয়ার এবং সামনে রয়েছে চামড়ার সেই বিছানা, যার উপর রেখে কোন মানুষকে হত্যা করা হয়। আর সেই বিছানার ওপর হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকারীদের দশজনের লাশ জবাই করা অবস্থায় পড়ে আছে। এরপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং হুসাইনের রক্তে রঞ্জিত একটি লাঠি আমার চোখে ঘষে দিলেন। ঘুম থেকে জেগে আমি নিজেকে অন্ধ অনুভব করি।

(৩) ইবনুল জাওযী রহ. আরও বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন রাযি.-এর মাথা মোবারক তার ঘোড়ার গলায় লটকিয়েছিল পরবর্তীকালে তার চেহারা আলকাতরার মত বিবর্ণ হয়ে যায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো আরবের সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ছিলে, তোমার চেহারার এই দশা হল কিভাবে? সে বলল, যেদিন আমি ইমাম হুসাইন-এর মস্তক ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়েছিলাম সেদিন ঘুমের মধ্যে দুজন লোক এসে আমার বাহু ধরে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিয়ে যায় এবং আমাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেই আগুন আমাকে এভাবে ঝলসে দিয়েছে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এই হতভাগা মারা যায়।

(৪) ইবনুল জাওযী রহ. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মজলিসে কথাপ্রসঙ্গে আলোচনা উঠলো যে, হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে যারাই শরীক ছিল সবাইকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। লোকটি বলল, সম্পূর্ণ ভুল কথা; আমি এ হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিলাম অথচ আমার কিছুই হয়নি! অবাককাণ্ড হলো, লোকটি মজলিস শেষে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুদ্দী রহ. বলেন, সকালে আমি তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সে কয়লায় পরিণত হয়েছে।

(৫) যে লোকটি হযরত হুসাইন রাযি.-কে তীর ছুঁড়েছিল এবং পানি পান করার সুযোগ দেয়নি আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন পিপাসাকাতর করে দেন যে, কোনভাবেই তার পিপাসা দূর হচ্ছিল না। অনবরত পানি পান করেও সে পিপাসায় ছটফট করছিল। এভাবে পানি পান করতে করতে একসময় সে পেট ফেটে মারা যায়।

হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকারীদের উপর এমনিতেই বিভিন্ন রকমের যমীনী ও আসমানী বালা-মুসীবতের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু শাহাদাতের ঘটনার মাত্র পাঁচ বছর পর হিজরী ৬৬ সালে মুখতার সাকাফী যখন হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণের ইচ্ছা করলেন তখন সর্বসাধারণ তাঁকে সমর্থন দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিপুল শক্তি অর্জন করে কুফা ও ইরাকের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি ঘোষণা করেন, হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকারীদের ছাড়া সবাইকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হলো। অন্যদিকে তিনি হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন এবং এক-একজনকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। এতে একদিনেই ১৪৮ জনকে হত্যা করা হয়। অতঃপর বিশেষ আসামীদের অনুসন্ধান ও গ্রেফতারের কাজ শুরু হয়।

উমর ইবনে হাজ্জাজ যুবাইদী গরম ও পিপাসা নিয়েই পালিয়েছিল। একসময় সে পিপাসায় বেহুশ হয়ে পড়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই তাকে জবাই করে দেয়া হয়। শিমর ছিল এই হত্যাকাণ্ডে সর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর এজন্য তাকে হত্যা করে ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ জুহানী, মালেক ইবনে বশীর এবং হামল ইবনে মালিককে অবরোধ করা হয়। তারা ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করে। উত্তরে মুখতার বলেন, জালেমের দল! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করোনি তোমাদের প্রতি কিভাবে দয়া প্রদর্শন করা হবে? এরপর সকলকেই হত্যা করা হয়। মালেক ইবনে বশীর হযরত হুসাইন রাযি.-এর টুপি খুলে নিয়েছিল। তার উভয় হাত-পা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে খোলা ময়দানে রেখে দেয়া হয়। এভাবে সে ছটফট করতে করতে মারা যায়।

উসমান ইবনে খালেদ এবং বশীর ইবনে সামীত মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যায় সহযোগিতা করেছিল, তাই তাদেরকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উমর ইবনে সাদ নামক যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন রাযি.-এর মোকাবেলায় সৈন্য পরিচালনা করেছিল তাকে হত্যা করে তার মাথা মুখতারের সামনে উপস্থিত করা হয়। এদিকে মুখতার পূর্বেই উমর ইবনে সাদের ছেলে হাফসকে তার দরবারে বসিয়ে রেখেছিলেন। যখন উমর ইবনে সাদের মাথা দরবারে উপস্থিত করা হয় তখন মুখতার হাফসকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি কি জানো এটা কার মাথা? সে বলল, হ্যাঁ জানি এবং এরপর আমারও আর বেঁচে থাকার সাধ নেই! তখন তাকেও হত্যা করা হয়। এরপর মুখতার বলেন, উমর ইবনে সাদকে তো হত্যা করা হলো হুসাইন রাযি.-এর বিনিময়ে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এরপরও বরাবর হয়নি। যদি আমি কুরাইশদের তিন চতুর্থাংশকে শুধু হুসাইনের বিনিময়ে হত্যা করে ফেলি তবুও হযরত হুসাইনের একটি আঙ্গুলের বরাবর হতে পারে না।

হাকিম ইবনে তোফায়েল নামক যে ব্যক্তিটি হুসাইন রাযি.-কে তীর নিক্ষেপ করেছিল, তার শরীর তীরের আঘাতে চালুনি করে দেয়া হয় এবং এতেই সে খতম হয়ে যায়।

যায়েদ ইবনে রিফাদ হযরত হুসাইনের ভাতিজা মুসলিম ইবনে আকীলের পুত্র আবদুল্লাহকে তীর নিক্ষেপ করেছিল, তখন তিনি হাত দিয়ে কপাল আড়াল করেন। তীর কপালে বিদ্ধ হয় এবং হাতটিও কপালের সঙ্গে বিঁধে যায়। এই ব্যক্তিকে বন্দী করে প্রথমে তার উপর তীর ও পাথর বর্ষণ করা হয়, পরে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

সিনান ইবনে আনাস নামক যে পাষণ্ড ইমাম হুসাইন রাযি.-এর মাথা মোবারক বিচ্ছিন্ন করতে অগ্রসর হয়েছিল সে নিজেই কুফা থেকে পালিয়ে যায় এবং তার ঘর ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে তার প্রাপ্য এভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, ৬৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ শনিবার ইবরাহীম ইবনে আশতারের হাতে তার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

মুখতার ইবনে আবূ উবায়দা– ইবনে যিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। ইবনে যিয়াদ নিহত হওয়ার পর তার ও অন্যান্যদের মাথা মুখতারের নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন একটি সাপের আবির্ভাব ঘটলো এবং সেটি ছোটাছুটি শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সাপটি ইবনে যিয়াদের মুখ দিয়ে ঢুকে নাক দিয়ে বের হলো। অতঃপর পুনরায় নাক দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো। এভাবে সাপটি বারবার তার নাক-মুখ দিয়ে ঢুকতে ও বেরুতে লাগলো এবং এটা কেবল ইবনে যিয়াদের মাথার সঙ্গে ঘটলো। অতঃপর মুখতার ইবনে যিয়াদ ও তার সঙ্গীদের মাথা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মতান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নিকট প্রেরণ করল। তারপর এগুলো মক্কায় প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। আর ইবনে যিয়াদ ও অন্যান্যদের মাথাবিহীন দেহগুলো ইবনে আশতার আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেন। (আইনী)

ইবনে যিয়াদের মুখে সাপ প্রবেশের ঘটনাটি হাফেয ইবনে কাসীরও ইমাম তিরমিযীর বরাতে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া ৮/১৯১)

বস্তুত এ ঘটনা 'কূপ খননকারী নিজেই কূপে পতিত হওয়া'র একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকারীদের এ দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি জানার পর আপনা-আপনি কুরআনের এ আয়াত মনে পড়ে যায়– (অর্থ:) আযাব এরূপই হয়ে থাকে। আর আখিরাতের আযাব এর চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর। হায় যদি তারা বুঝতো! (সূরা কলম-৩৩)

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর:

প্রশ্ন হতে পারে, যেখানে স্বয়ং নবীদৌহিত্র জালিমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন– সাহাবায়ে কেরামের বিরাট এক কাফেলা হায়াতে থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর সহযোগী হননি, যার ফলে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় ইমাম হুসাইন রাযি.-কে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করতে হল?

জবাব: ইমাম হুসাইন রাযি. ইয়াযীদের মোকাবেলায় কুফাবাসীর বাইআত গ্রহণের ব্যাপারে দু'টি ইজতিহাদ তথা গবেষণা করেছিলেন।

এক: খিলাফত পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের জন্য যে সব যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন তাঁর মধ্যে তা বিদ্যমান রয়েছে।

দুই: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ জনবল ও একনিষ্ঠ কর্মী দরকার তা-ও তাঁর আছে। কেননা কুফার ১৮ হাজার মানুষের পক্ষ হতে ইমাম হুসাইন রাযি.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ ও তাকে সর্বত সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করে দেড়শত চিঠি তার কাছে পৌঁছেছিল। বস্তুত এই

চিঠিগুলোই তার দ্বিতীয় ইজতিহাদ করার পক্ষে দলীল ছিল।

প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম তো পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আর কম বয়সী সাহাবা রাযি. যারা হায়াতে ছিলেন এবং ইমাম হুসাইন রাযি.এর আশপাশে ছিলেন তাঁরা ইমাম হুসাইন রাযি.-এর প্রথম ইজতিহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইজতিহাদের ব্যাপারে তারা ইমামের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাদের ইজতিহাদ ছিল, রাষ্ট্র পরিচালনা ও জিহাদের কমান্ডিংয়ের ব্যাপারে ইমাম হুসাইন রাযি.-এর যোগ্যতা সন্দেহাতীত কিন্তু এই পরিস্থিতিতে উক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য যে পরিমাণ পর্যাপ্ত জনবল ও জানবায কর্মী অপরিহার্য তা তাঁর নেই। কেননা কুফাবাসীর কথার উপর আস্থা রাখা যায় না।

সুতরাং এমতাবস্থায় তাঁকে সহযোগিতা করলে কেবল রক্তপাতই বাড়তে থাকবে। বস্তুত এই দ্বিতীয় ইজতিহাদের মতানৈক্যই উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে তার সঙ্গে শরীক হতে বিরত রেখেছিল এবং ইজতিহাদের এই পার্থক্যের কারণে তাদের ব্যাপারে ইমাম হুসাইন রাযি.-এর কোন আক্ষেপ ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

উপসংহার: যাই হোক ইমাম হুসাইন রাযি.-এর এই সময় এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উঠে দাঁড়ানো উম্মতের ফায়দার স্বপক্ষে ছিল। আর তিনি যদি খিলাফত প্রাপ্তির আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে তার এই আশাও যথাযথ ছিল এবং বাস্তবেও তিনি ছিলেন এর সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

এখন রয়ে গেলো খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাহ্যিক আসবাবপত্র আর বিশ্বস্ত ও পর্যাপ্ত সহকর্মীদের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপার। তো পরবর্তী ঘটনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত হুসাইন রাযি.-এর এই পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হয়নি। কারণ তিনি নিজের তৎপরতার কেন্দ্র হিসেবে ইরাককে বেছে নিতে চেয়েছিলেন এবং একথা বারবার পরীক্ষিত হয়ে যাওয়ার পরও যে, ইরাকবাসীরা কাপুরুষ, লোভী আর বিশ্বাসযোগ্য নয়– তাদের সাহায্য সহযোগিতার ভরসায় হেজায ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

ইসলামী ঐতিহাসিকদের ধারণা, হযরত হুসাইন রাযি. যদি স্বীয় সহমর্মী আর বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ মেনে নিতেন এবং ইসলামের নাভিমূল অর্থাৎ মদীনা বা মক্কাকে তার তৎপরতার কেন্দ্র বানাতেন তাহলে পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে আসীরের নিম্নলিখিত বর্ণনার উপর যখন দৃষ্টি পড়ে তখন কলম থমকে যায় এবং ঐতিহাসিকদের সমস্ত বিশ্লেষণ ওলট-পালট হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন– হযরত হুসাইন রাযি. যখন স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর তাকে রাস্তায় ঘিরে ধরলেন এবং ফিরে আসার জন্য বারবার আবেদন জানালে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. তাকেও এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি যখন কোনভাবেই মানতে রাজি হলেন না তখন হযরত হুসাইন রাযি. আসল কথা প্রকাশ করে দিলেন। বললেন, আমি স্বপ্নে নানাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেছি। তিনি আমাকে একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমি সেটা অবশ্যই করব; চাই তার ফলাফল যাই হোক না কেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর জিজ্ঞেস করলেন কি সেই কাজ? হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, সে কথা আমি কাউকে বলিনি আর বলবও না; যতক্ষণ না আমি স্বীয় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যাই। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৮/১৭৫)

ঘটনা যখন এ-ই তখন খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাহ্যিক আসবাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর এই বিতর্কে যাওয়ারও অবকাশ থাকে না যে, স্বপ্ন শরয়ী দলীল হতে পারে কিনা। কেননা এটা তো মুহাব্বত ও ভালোবাসার জগৎ; এখানের নিয়ম কানুনই আলাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে স্বপ্নে দেখল সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই দেখল; এখানে ভুল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের ইশারায় আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার নজীর স্থাপনের জন্য যা প্রয়োজন ছিল সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং ইমাম হুসাইন রাযি.-এর পদক্ষেপ বাস্তবমুখী ছিল কিনা এ বাহাস-বিতর্ক অনর্থক। তিনি অবশ্যই সঠিক কাজটি করেছিলেন আর এটাই তার স্বপ্নের ইঙ্গিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও তার দীনের বুলন্দীর জন্য জান-মাল, ইযযত-আওলাদ সবকিছু কুরবানী করার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

(২৭ পৃষ্ঠার পর : ইয়াদেঁ)

নানান যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করতে চাইতো যে, এ জায়গা ছেড়ে দিলে এখানে হযরতুল আল্লাম রহ.-এর মর্যাদার পরিপন্থী কাজ হতে পারে। কিন্তু যে হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বৈ চাওয়া-পাওয়ার কিছুই ছিলো না সে হৃদয় এতসব যুক্তি-প্রমাণে যাবে কেন? আব্বাজানের সিদ্ধান্ত তো এটাই ছিল যে, দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপন কোনও রকম বিবাদের উপর হবে না। তিনি স্বীয় বুযুর্গদের থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন।

ইতোপূর্বে কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব গঙ্গুহী রহ.ও এমন আদর্শ তৈরি করে গেছেন। তিনি হযরত শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী রহ.-এর পরিত্যক্ত খানকা আবাদ করে সেখানে কুরআন-হাদীসের তালীমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বহু বছর সেখানে দীনী তালীমের দরসও চালু ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন শায়খ রহ.-এর খান্দানের লোকেরা আপত্তি তুললো, তিনি এতদিন ধরে চলে আসা সেই দীনী শিক্ষাকার্যক্রম মুহূর্তেই বন্ধ করে দেন।

হযরত আব্বাজান রহ. তো তাঁরই রূহানী সন্তান ছিলেন। সুতরাং তার সেই সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে যতই বেদনাবিধুর ও বিস্ময়কর মনে হোক না কেন, তাঁর জন্য ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাঁর চিরাচরিত নীতি ও স্বভাব অনুযায়ী তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তা'আলা চাইলে দারুল উলূমের জন্য এরচেয়ে বহুগুণ উত্তম জায়গার ব্যবস্থা হতে পারে। সেজন্যই পরবর্তীকালে আমি বরেণ্য উলামা-মাশায়েখের মুখে শুনেছি, হযরত মুফতী ছাহেবের উদারনীতি ও কর্মতৎপরতা, তাঁর ইখলাস ও ন্যায়নিষ্ঠা এবং উচ্চমর্যাদা প্রমাণের জন্য তাঁর জীবনের এই একটি কাজই যথেষ্ট!

হযরতুল আল্লাম উসমানী রহ.-এর মাকবারা-সংলগ্ন জমির এই ঘটনা ঘটেছিল হিজরী ১৩৭৪ সালের জুমাদাল-উখরা মাসে। তারপর শা'বান মাসে আমাদের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত হয়। ১৩৭৪ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। এ শিক্ষাবর্ষেই আমরা হযরত আব্বাজান রহ.-এর ইখলাস ও তাওয়াক্কুলের অসীম বরকত দেখতে পাই। উল্লিখিত ঘটনার কয়েক মাস না যেতেই আল্লাহ তা'আলা দারুল উলূমের জন্য তারচেয়ে বহুগুণে বড় জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। 'শারাফী গোঠ'স্থ সে জমিপ্রাপ্তির বিস্তারিত আলোচনা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)

নারী প্রসঙ্গে আমার কথা (২য় কিস্তি)

শাইখুল ইসলাম মুস্তাফা ছাবরী রহ.

শাইখুল ইসলাম মুস্তাফা ছাবরী রহ.। (১২৮৬-১৩৭৩ হি., ১৮৬৯-১৯৫৪ ঈ.) বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দীন। তুরস্কেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পড়াশোনার ধাপ পার করে মাত্র ২২ বছর বয়সে ইস্তাম্বুলের জামে' মুহাম্মাদ আল-ফাতিহে শিক্ষকতা শুরু করেন। একপর্যায়ে তুরস্কের শাইখুল ইসলাম পদে বরিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কামাল পাশার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। পরবর্তীকালে হিজরত করে সপরিবারে মিসরে পাড়ি জমান। সমকালীন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিভ্রান্তির খণ্ডন করে শেষজীবনে রচিত 'মাউকিফুল আকল ওয়াল ইলম ওয়াল আমাল' তার অমর কীর্তি। এছাড়াও রয়েছে তার বিভিন্ন রচনা, যা বরাবরই জ্ঞানবোদ্ধাদের খোরাক হয়ে এসেছে। বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি আধুনিক পশ্চিমা-নারীবাদ খণ্ডনে তার অসাধারণ কিছু চিন্তাগাথা। এটি তিনি নারীবাদ ও পাশ্চাত্যবাদের আগ্রাসনের অন্যতম প্রবেশপথ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার মুসলিম নামধারী নারীবাদীদের খণ্ডন করে লিখেছেন। প্রবন্ধ দু'টি প্রথমে মিসরের আল-ফাতাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর দু'টি প্রবন্ধকে একত্র করে পুস্তিকা আকারে কায়রোর মাতবা'আ সালাফিয়্যা থেকে ১৪৫৪ হি.-১৯৩৫ ঈ. প্রকাশিত হয়। আদর্শিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে বক্তব্যের জোর ও যুক্তির ধার বিবেচনায় আজকের দিনেও প্রবন্ধ দু'টি সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিধায় রাবেতার পাঠক সমীপে অনুবাদ পেশ করা হলো। –সম্পাদক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পুনরায় বহুবিবাহ এবং বিবাহ-বহির্ভূত বহুগামিতার তুলনামূলক আলোচনায় ফিরে যাই। যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের অনুকরণের মানসিকতা নিয়ে তৃপ্ত হতে চায়, তারা বিবাহ-বহির্ভূত বহুগামিতাকে বহুবিবাহের উপর প্রাধান্য দিতে আগ্রহী। আবার তারা নারীদের মুখ দিয়ে এই নিজস্ব রুচি ও প্রাধান্যদানকে বলিয়ে নিতে চায়। আমার উল্লিখিত বইয়ে আমি লিখেছিলাম যে, অবৈধ বহুগামিতায় দশ ধরণের ক্ষতি হয়–

০১. স্বামীর চারিত্রিক পবিত্রতা বিনাশ হয়।

০২. যে নারীর সঙ্গে অবৈধভাবে মিলন হয়েছে তার চারিত্রিক পবিত্রতা বিনাশ হয়।

০৩. ব্যভিচারী পুরুষের স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তার স্বামী চরিত্র হারিয়েছে।

০৪. স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে স্ত্রীর নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা বিনাশের আশঙ্কা থাকে।

০৫. প্রতিশোধ নিতে গিয়ে স্ত্রীর চরিত্র বিনাশ হলে এতে স্বামীটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা তার স্ত্রীও চরিত্র হারিয়েছে।

০৬. ব্যভিচারী ব্যক্তি যে নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সে নারীটি বিবাহিত হলে তার স্বামীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

০৭. প্রতিশোধ গ্রহণকারী স্ত্রী যদি কোন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় সেই পুরুষের স্ত্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

০৮. ব্যভিচারী নর-নারী কর্তৃক গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট করা সন্তানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

০৯. অবৈধ মিলনের কারণে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে খোদ ব্যভিচারী নারী-পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১০. ব্যভিচারী নারী-পুরুষদের স্বামী ও স্ত্রীদের শরীরে রোগ ছড়ানোর আশংকা থাকে।

এই দশটি ক্ষতির শেষ তিনটি এমন যে, পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ হিকমত বা সৃষ্টিরহস্য হলো, এ ধরনের অবৈধ মিলনের কারণে জটিল সব রোগের সৃষ্টি হয়। অবৈধ বহুগামিতার এই দশ রকম ক্ষতির বিপরীতে বহুবিবাহের মধ্যে শুধু একটি ক্ষতি বিদ্যমান থাকে, যা কেবল স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটা হলো, তার স্বামী আরেক নারীকে বিয়ে করেছে এই মানসিক যন্ত্রণা। এখন এই ক্ষতি যদিও স্বামীকে একান্তই তার জন্য হওয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কিন্তু এটা এই নারীর মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। কারণ তার স্বামী এখানে ইসলামপ্রদত্ত অধিকারকে প্রয়োগ করেছে। আর এ ধরণের ক্ষতি মেনে নেয়ার রেওয়াজ স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিদ্যমান। উদাহরণত কোনো সন্তানের যখন সহোদর ভাই/বোন জন্ম গ্রহণ করে তখন সেই একক সন্তানের ক্ষেত্রে মা-বাবা একান্তভাবে শুধু তার জন্য হওয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; তথাপি এটা সবাই মেনে নেয়।

আমি এমন নই যে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আন্তরিকতা, হৃদয়ের বন্ধন এবং জীবন-মরণ সম্পর্কের মূল্যায়ন করি না। এমনিভাবে ঐ সকল হৃদয়বান পুরুষদেরও অবমূল্যায়ন করছি না– স্ত্রীর প্রতি হৃদ্যতা, নিদেনপক্ষে তার প্রতি করুণাবোধ যাদেরকে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত রাখে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যার হৃদয় আমার উম্মতের জন্য কোমল হয় আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন।' [বর্ণনাটি আদদুররুল মুখতার প্রণেতা নিজ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তবে লেখকের বর্ণিত শব্দে আমরা হাদীসের কিতাবে তা পাইনি। সামান্য ভিন্ন শব্দে মুসনাদে আহমাদে (হাদীস নং ২৪৩৩৭) হযরত আয়েশা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার শব্দগুলো নিম্নরূপ– اللهم من رفق بأمتي فارفق به অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের প্রতি কোমল হয় আপনি তার প্রতি সদয় হউন। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. টীকায় লিখেছেন, হাদীসটি সহীহ। –অনুবাদক]

তবে আমার যে বিষয়টি বুঝে আসে না তা হলো, বহুবিবাহবিরোধী লেখকগণ যারা প্রথম স্ত্রীর মনরক্ষা ও তার ভালোবাসার বিষয়টির প্রতি খুব লক্ষ রাখছেন এবং গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে ভাব ধরে থাকেন, তারাই আবার স্বামী যখন দ্বিতীয় বিয়ের বদলে পরনারীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে প্রথম স্ত্রী ও তার ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা করে তখন সেটাকে খুব হালকাভাবে দেখেন! অথচ দ্বিতীয় বিয়ে না করে পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া প্রথম স্ত্রীর হৃদয়ের উপর অধিক শক্ত ও মারাত্মক আঘাত। কারণ এর মাধ্যমে ভালোবাসায় এমন অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়, যা অংশ-সাব্যস্তকারী এবং অংশীদার উভয়ের অধঃপতনকে নিশ্চিত করে।

এখানে আরও বলতে হয় যে, বহুবিবাহ প্রথম স্ত্রীর জন্য যতোই পীড়াদায়ক ও ক্ষতিকর হোক না কেন তাতে তারই মতো অপরাপর নারীর উপকার নিহিত রয়েছে। কারণ তার স্বামী এই দ্বিতীয় নারীকে মর্যাদাহীন বান্ধবী না বানিয়ে তাকে প্রথম স্ত্রীর মতোই স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে। বিবেক যদি বহুবিবাহকে অবৈধ বহুগামিতার সঙ্গে ইনসাফের চোখে তুলনা করে দেখে– এটা যখন সুনিশ্চিত যে, মানবিক প্রয়োজনের কারণে অবৈধ

বহুগামিতা বহুবিবাহের জায়গা দখল করবেই– তবে সে অবশ্যই এই সমাধানে পৌঁছবে যে, বহুবিবাহ নারীজাতির ব্যাপকতর কল্যাণ ও স্বার্থের অধিক অনুকূল। বহুবিবাহ-বিরোধীরা আসলে কিছু নারীর স্বার্থ দেখে; কিন্তু অপরাপর নারীদের স্বার্থ এড়িয়ে যায়।

এমনিভাবে যদি বলা হয় যে, বহুবিবাহ নারী-পুরুষের সমতাকে লঙ্ঘিত করে। কারণ এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা থাকছে না। তবে এর পরিষ্কার জবাব হলো, নারীর প্রকৃতিই এই অসমতার ঘোষণা দেয়। কারণ নারীর প্রকৃতি এই অনুমতি দেয় না যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মোকাবেলা একাধিক স্বামী গ্রহণের মাধ্যমে করা হবে; যেমনটি আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা করে এসেছি। তদুপরি নারী বছরে শুধু একবার সন্তান জন্ম দিতে পারে। অথচ পুরুষের উৎপাদনশীলতা প্রতিনিয়ত নবায়ন হতে থাকে এবং এক্ষেত্রে তার কোন সীমাবদ্ধতাও নেই। নারীর জন্য তার ঋতুস্রাব, প্রসববেদনা এবং গর্ভস্রাবের সময় পুরুষের প্রয়োজন থাকে না। নারীরা পুরুষের আগেই বার্ধক্যে উপনীত হয়; ফলে সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে পড়ে। তদুপরি নারীরা বুড়িয়ে যাবার আগে ফুরিয়েও যায়; প্রথমে কুমারী অতঃপর বিবাহিতা তারপর মা। এই প্রতিটি ধাপে একজন নারী তার কমনীয়তা হারাতে থাকে। এখন যদি নারীর প্রতি ইনসাফ করতে গিয়ে আমরা নারীকে পুরুষের সমান্তরালে দাঁড় করিয়ে দেই, তবে প্রকৃতিগতভাবে অগ্রসর পুরুষের উপর জুলুম করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা কি দেখে না, মায়েরা পর্যন্ত ছেলেসন্তান জন্ম দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়! এটা কি নারীর পক্ষ থেকে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিদান নয়!? [লেখক এখানে নারীদের মনস্তত্ত্বের বাস্তব দিকটি তুলে ধরার জন্য বিষয়টির অবতারণা করেছেন। না-হয় ছেলেসন্তান কামনা করতে গিয়ে মেয়েসন্তানকে অপছন্দ করা শরীয়তগর্হিত বিষয়। ইসলামে মেয়েসন্তান লালন-পালনের সবিশেষ ফযীলত রয়েছে। –অনুবাদক]

বর্তমান যুগে নারী-পুরুষের সমতার দাবী প্রসার লাভ করেছে। কিছু পুরুষ এক্ষেত্রে পালে হাওয়া দিয়েছে এবং নারীদের হয়ে ওকালতি করেছে। আগেই বলেছি, পুরুষদের এই ওকালতির উদ্দেশ্য হলো নিজেদের বদমতলব চরিতার্থ করা। সমতার দাবীতে একাত্ম হয়ে বস্তুত তারা নারীদের কাছাকাছি হয়ে বদমতলব হাসিলের চেষ্টা করছে। সমতার এই দাবী যদি বাস্তবায়িত হয় অর্থাৎ নারীদেরকে পুরুষদের সমকক্ষতা প্রদান করা হয়, তবে তা হবে এমন সমতা যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

বর্তমান যুগে জুতোর হিল উঁচু করে নারীরা পুরুষদেরকেও ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা করছে। কিন্তু এটা এমন প্রতিযোগিতা যাতে জোরাজুরি করে এবং সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যকে বদলে দিয়ে জেতার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ এই প্রতিযোগিতায় তাঁদের জুতোসহ মুখথুবড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উপরে বলা হয়েছে, পুরুষের রয়েছে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনক্ষমতা। এমনকি এক্ষেত্রে একদল নারী মিলেও একজন পুরুষের বরাবর হতে সক্ষম নয়। ঠিক এ কারণেই বংশবৃদ্ধির জন্য জাতি-পরম্পরায় প্রচলিত পন্থা হলো একজন পুরুষকে একাধিক নারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ বহুবিবাহকে কার্যকর করা। এটি এমন এক ইসলামী মূলনীতি যা বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। পশ্চিমা একটি রাষ্ট্রও যদি এই মূলনীতি বাস্তবায়ন করে ফেলে তবে তো প্রতিপক্ষের মুখে বিলকুল রা' থাকবে না। কেননা শক্তি অর্জনের নিমিত্তে বংশবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সকল জাতিগোষ্ঠীর আগ্রহের বিষয়। এর উপকারিতা নিয়ে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। আর এর স্বাভাবিক ও সহজতম পন্থা হলো বহুবিবাহের মাধ্যমে পুরুষের উৎপাদনক্ষমতা কাজে লাগানো। তবে এক লেখককে দেখা গেলো, 'আহরাম' পত্রিকায় তার নিয়মিত কলামের এক লেখায় মিসরীদেরকে অধিক সন্তান গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছেন। অথচ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত এখন নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা করছে। যারা অধিক সন্তান জন্ম দিচ্ছে তাদেরকে বিভিন্ন পুরস্কার ও উপঢৌকন দিচ্ছে। অথচ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই বলে গিয়েছেন, 'তোমরা বিয়ে-শাদী করো! সংখ্যাবৃদ্ধি করো! কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য জাতির উপর গৌরব করবো।' [মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হাদীস ১০৩১, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার; হাদীস ১৩৪৪৮, আত-তালখীসুল হাবীর ৩/২৫০। –অনুবাদক]

এই লেখকের অদ্ভুত মতামত দেখে আমার আশ্চর্য লেগেছে। আল্লাহর শোকর যে, লোকটা বহুবিবাহ প্রসঙ্গে মাথা গলায়নি। কারণ এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করলে তিনি বংশবৃদ্ধিকে বহুবিবাহের ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় ঢুকিয়ে ছাড়তেন। এর চেয়েও তাজ্জবের ব্যাপার হলো তুর্কির এক বড় লেখকের ঘটনা। আমার সঙ্গে বিতর্ককালে তিনি স্বীকারই করতে চাইলেন না যে, বহুবিবাহ জনসংখ্যায় প্রবৃদ্ধি ঘটায়। এখানে তার প্রসঙ্গটি টানলাম এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষের গোঁড়ামির নমুনা দেখানোর জন্য। এটাই প্রমাণ যে, তাদের অবস্থান কতটা দুর্বল। কেননা নিজেদের দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য চাক্ষুষ বিষয়কেও তাদের অস্বীকার করার দরকার পড়ে যায়।

তারপর কথা হলো, পুরুষেরা জীবনের সুকঠিন দায়িত্বগুলো বহন করে। এগুলোর কোনো কোনোটিতে এই আধুনিক যুগেও নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের সমান্তরাল হওয়া থেকে বহু দূরে। ধরুন, মৌলিকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের নির্মম বোঝা ও দায়-দায়িত্ব পুরুষদের কাঁধে। যুদ্ধগুলোতে স্রোতের মত যে রক্ত প্রবাহিত হয় সে-তো পুরুষদের রক্ত। সুতরাং জাতির প্রয়োজনে নারীদেরও এমন কিছু আত্মত্যাগ করা চাই যা পুরুষদের আত্মত্যাগের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। পুরুষদের আত্মত্যাগ তাদেরকে যে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন করে, নারীদের আত্মত্যাগ যেন তার কিছুটা পুষিয়ে দিতে পারে। সে কারণেই নারীদের জন্য বাঞ্ছনীয় যে, তারা আত্মসংগ্রাম করে পুরুষদের একাধিক বিবাহতে নিজেকে মানিয়ে নেবে। যেন এই ভারী বোঝা বহনের মাধ্যমে তারা পুরুষদের যুদ্ধের ময়দানে আত্মত্যাগের বিনিময়ে কিছু করতে পারে।

উপরে এক ভিন্নমতের লেখকের বক্তব্য উল্লেখ করেছিলাম যে, 'যদি যুদ্ধ হয় এবং সেখানে বিরাট সংখ্যায় পুরুষরা মারা যায়, তখন গিয়ে না-হয় আমরা আমাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসতে পারি এবং প্রেক্ষাপট বিচারে বহুবিবাহ বাস্তবায়ন করতে পারি।' তার এই কথাটাই তো বহুবিবাহের মূলনীতির স্বীকৃতিদান যে, বহুবিবাহ যুদ্ধের বিপরীতে নারীদের উপর পুরুষদের অধিকার। এই স্বীকৃতি তার মুখ দিয়ে অজান্তে বের হয়ে গেছে। তিনি অজান্তেই একথার স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছেন যে, বহুবিবাহ যদি যুদ্ধ-পরবর্তী পুরুষসংকটের জন্য রেখে দেওয়া হয় তবে তার স্বস্বীকৃত স্বার্থটাই রক্ষা হয় না। কারণ যে বহুবিবাহ যুদ্ধ-টুদ্ধ সংঘটিত হয়ে বহু লোকজন মারা যাওয়ার পর বাস্তবায়ন করা হবে, তার ফলাফল যুদ্ধ শেষ হবার দশ-বিশ বছর সামনে আসবে। অথচ একটি সচেতন জাতির জন্য আবশ্যক হলো, একটি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই পরবর্তী যুদ্ধের জন্য

তারা সক্ষম থাকবে। সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো, তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, কখন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার অপেক্ষায় থাকবে না। আমি পঁচিশ বছর আগে তুরস্কে থাকাকালীন লিখেছিলাম যে, বহুবিবাহ– যার বোঝা নারীদের বহন করতে হয় তা পুরুষদের যুদ্ধসমূহের বিপরীতে প্রদত্ত। পরবর্তী সময়ে আমি এ বিষয়ে একটি হাদীস শরীফ পেয়েছি, যা আমি আমার পূর্বে উল্লিখিত কিতাবে সন্নিবেশিত করেছি। হাদীসটি এই– 'আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে গাইরাত বা আত্মমর্যাদাবোধ দান করেছেন। আর পুরুষদেরকে দিয়েছেন জিহাদের বিধান। অতএব যে নারী ঈমান ও সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করবে তার জন্য রয়েছে শহীদের বরাবর প্রতিদান।' হাদীসটি ইমাম তাবারানী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সূত্রে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণনা করেছেন। (দ্র. আল-জামিউস সগীর) এই হাদীসে বহুবিবাহের প্রসঙ্গে ঈঙ্গিত রয়েছে। কারণ নারীদেরকে আত্মমর্যাদাবোধ দান করার অর্থ হলো, তাদেরকে এমন কিছু দেওয়া হয়েছে যা আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। আর মহিলাদের আত্মমর্যাবোধ জাগিয়ে তোলার সবচেয়ে কার্যকর বিষয় বহুবিবাহ। আমরা এই ব্যাখ্যা এজন্য করলাম যে, আত্মমর্যাদাবোধ পুরুষদের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাদেরকে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে এমন বিষয় সহ্য করার বিধান দেওয়া হয়নি, যেমনটি নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

কথা লম্বা হয়ে গেলো। পরিশেষে সারকথা এই যে, বহুবিবাহ ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য ঢাল স্বরূপ। আর যে জাতি বহুবিবাহকে বাস্তবে পালন করে তাদের জন্য তা অফুরন্ত শক্তির উৎস।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ: পর্দা ও পর্দাহীনতা

এ বিষয়ে মতবিরোধ নেই যে, প্রাচ্য হলো জ্ঞান ও সভ্যতার পটভূমি। এর গোড়ার কারণ হলো, এটি নবীগণের জন্মভূমি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর অবতরণস্থল। এমনকি গ্রীক সভ্যতা যা ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা এবং যা থেকে পশ্চিমারা– ইসলামী জ্ঞান ও সভ্যতার আলো বিজেতা আরবদের হাত ধরে স্পেন হয়ে তাদের নিকট পৌঁছার আগে– সভ্যতার আলো পেয়েছিল, সেই গ্রীক সভ্যতাও গ্রীক উপকূল-সংলগ্ন এশিয়ান উপকূলবর্তী অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও নানাবিধ সম্পর্কের মেলামেশা থেকেই গ্রীকরা পেয়েছিল। বলাবাহুল্য যে, এদিক দিয়ে গ্রীকরাও মূলত প্রাচ্যের অভিবাসী।

এ বিষয়েও মতবিরোধ নেই যে, পর্দাহীনতা বা উদোম থাকা মানুষের প্রাথমিক ও গেঁয়ো অবস্থা। আর পর্দা বা শরীর ঢাকা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থার পরবর্তী সময়ে সংযোজিত। এটা তার ধর্মীয় বা চারিত্রিক সচেতনতা দ্বারা পূর্ণতা লাভের কারণে সংযুক্ত হয়েছে। এই সচেতনতা তাকে স্বভাবগত জৈবিক ব্যাপারগুলোতে অনিয়ম থেকে বিরত রাখে, সেগুলোর পথ বন্ধ করে এবং নারী-পুরুষের মাঝে একটি পার্থক্য-প্রাচীর তৈরি করে দেয়। আর পর্দা শুধু নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে কারণ পুরুষ বাড়ির বাইরে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া জৈবিক ক্ষেত্রে পুরুষ থাকে অনুসন্ধানীর ভূমিকায় আর নারী উদ্দীষ্টের ভূমিকায়। সুতরাং অনুসন্ধান ও প্রস্তাব পুরুষের দিক থেকে হয়ে থাকে, আর নারী তা গ্রহণ করে বা প্রত্যাখ্যান করে। নারীর পর্দা হলো সেই প্রত্যাখ্যানের নিদর্শন বা প্রতীক যা সে পুরুষের সামনে ধারণ করে থাকে, যেন আলাদাভাবে হাত কিংবা মুখ দ্বারা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতির প্রয়োজন না থাকে। অতএব পর্দার মাঝে রয়েছে পুরুষের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে নারীর জন্য সুরক্ষা। সুতরাং যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীর প্রতি নিবিষ্ট হয় এবং তাকে চোখের ইশারায় নিজের প্রতি আগ্রহী করতে চায়, আর সে নারী তার আবেদনে সাড়া দিতে চায় তখন সে নিজের পর্দাকে উন্মোচন করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীটি পুরুষের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আর কোনো নির্দিষ্ট পুরুষের আবেদন ছাড়াই যদি নারী পর্দা উন্মোচন করে তবে তা হলো নিবেদনের পূর্বেই অগ্রীম সাড়াদানের কিংবা পুরুষকে নিবেদন করার জন্য উস্কানী দেওয়ার আলামত। আর ব্যাপক পর্দাহীনতা হলো নারীর ব্যাপক সাড়াদান বা উস্কানীদানের আলামত। [অর্থাৎ যে কোনো পুরুষ যখন চাইবে তাকে পেয়ে যাবে–অনুবাদক]

তারপর কথা হলো, পর্দা একদিকে স্বভাবগত জৈবিক ক্ষেত্রগুলোতে বিশৃঙ্খলা দূর করে সীমাবদ্ধতা টেনে দেয় এবং এই হিসেবে পর্দা মানুষের স্বভাবচাহিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু অপরদিকে পর্দা মানুষের স্বভাবগত আত্মসমম্মানবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে এবং এই হিসেবে স্বভাবের অনুকূলও বটে। তবে লক্ষণীয় হলো, আত্মসম্মানবোধ এমন স্বভাব যা রুহ থেকে শক্তিগ্রহণ করে, আর জৈবিক ক্ষেত্রগুলোতে বন্ধনহীনতা এমন স্বভাব যা শক্তি লাভ করে শারীরিক চাহিদা থেকে। ফলে বন্ধনহীন থাকতে চাওয়ার স্বভাব পর্দামুক্তির প্রতি উসকে দেয়, অপরদিকে আত্মসম্মানবোধ পর্দা-পুশিদার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই দুই স্বভাবের মধ্যে রয়েছে দূরত্ব ও দ্বৈরথ যা মানুষের মনোজগতে চলমান থাকে। পশ্চিমা সভ্যতা প্রথম স্বভাবের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পশ্চিমা সভ্যতার ধারকদেরকে নারীদের পর্দাহীনতা এবং নাইটক্লাব ও বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট উপভোগ থেকে বঞ্চিত করবে না। এই উপভোগের খাতিরে পশ্চিমা সভ্যতা অপর স্বভাবটিকে বিসর্জন দিয়েছে। ফলে পশ্চিমা পুরুষ নিজের স্ত্রী, সহোদরা ও কন্যার বিষয়ে আত্মসম্মানবোধ ত্যাগ করেছে। পরপুরুষেরা তার আপন নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করে, উপবেশন করে আবার জড়িয়েও ধরে। এর বিনিময়ে সে নিজেও উদোম ও অর্ধ-উলঙ্গ অপর নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের হাতে চুম্বন করে, তাদের সঙ্গে উপবেশন করে, জড়িয়ে ধরে। সে চিন্তা করে আমার তো বিসর্জনের চেয়ে অর্জন বেশি! আর কখনো তো বিসর্জনের কেউ থাকে না (স্ত্রী, সহোদরা বা কন্যা), তখন তো পুরোটাই অর্জন। নৃত্যজলসা যা পাশ্চাত্য সামাজিক সভ্যতার অপরিহার্য অংশ এগুলো অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতিকে প্রকাশ্য সমর্থন ছাড়া কিছুই নয়। এগুলোর মাধ্যমে নারী-পুরুষ একে অপরের কাছে আসে এবং ঘনিষ্ঠ হয়। চোখের সামনে স্ত্রী, বোন ও কন্যাদের পরপুরুষের সঙ্গে এই মেলামেশা দেখে যাদের আত্মসম্মান জেগে ওঠার কথা এই নৃত্যজলসাগুলো তাদের আত্মসম্মানের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। এই জলসাগুলো এখন হয়ে গেছে গণমিলন উৎসব। আত্মসম্মানবোধের বিলুপ্তি পাশ্চাত্য সভ্যতায় এমন পর্যায়ে গেছে যে, এখন তারা আত্মসম্মানবোধ থাকাকে ত্রুটি হিসেবে গণ্য করে। অথচ মানুষ স্বভাবগতভাবেই অনুভব করে থাকে যে, আত্মমর্যাদাবোধ একটি উত্তম গুণ। পাশ্চাত্যের লেখক ও কবিরা এই মনুষ্যস্বভাব বদলে ফেলতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। উদাহরণত প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ কবি 'হুগো' (মৃত: ১৮৭২ ঈ.) 'লুগানোয়' সন্ধি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারকে লক্ষ্য করে লিখেন– 'আমরা মনে করি, জোরপূর্বক অধিকার করার ধ্যানধারণা এখন আবিষ্কারের মানস দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। অচিরেই উদার জাতিগত ভ্রাতৃত্ব রাজাদের **(৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচীর মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন মারকাযুল ফিকরি ওয়াল ইফতা'র ইফতা বিভাগের মুশরিফ– **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী**।*

ইয়াদেঁ - یادیں

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(দ্বাদশ পর্ব -بارہویں قسط)
আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর মাকবারা-সংলগ্ন জমিতে দারুল উলূম স্থানান্তর

১৩৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর অবতারণা হয়েছিল। এখানে তার কিছুটা বিবরণ দেয়া জরুরী মনে করছি।

তখনও পর্যন্ত করাচীতে দারুল উলূম ব্যতীত আর কোন দীনী মাদরাসা ছিল না। স্বভাবতই দারুল উলূমের ছাত্রসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে চলছিলো। একপর্যায়ে দেখা গেলো, দারুল উলূম নানোকওয়াড়া শাখায় আর ছাত্র সংকুলান হচ্ছে না। সবাই কোন প্রশস্ত জায়গায় দারুল উলূমের স্থানান্তরের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। এই প্রয়োজনীয়তা আব্বাজানের চেয়ে বেশি আর কে অনুভব করবেন!? সুতরাং তিনি সবসময় একটি প্রশস্ত জায়গার অনুসন্ধানে ছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও খোঁজাখুঁজির পর হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর মাকবারা সংলগ্ন একটি সুবিশাল পরিত্যক্ত ময়দানের সন্ধান পাওয়া গেলো।

পরিত্যক্ত সেই জমিটির মালিকানা লাভ এবং পরবর্তীতে মালিকানা ছেড়ে দেয়ার ঘটনাটি আব্বাজানের জীবনের একটি অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো। এ ব্যাপারে আমি আমার শায়খ ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ., হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরী রহ. এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরামকে বলতে শুনেছি যে, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর এই একটি কাজই তার আযমত, মহত্ব, সত্যবাদিতা, সরলতা এবং ইখলাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণের জন্য যথেষ্ট। এখনও পর্যন্ত এ ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা লিখিতভাবে কোথাও ছেপে আসেনি। অথচ এটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি ঘটনা। সে কারণে আমি এখানে এর সবিস্তার আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

হযরত আব্বাজান রহ. হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানীর রহ.-এর শিষ্য এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার সহযোদ্ধা ছিলেন। এছাড়া তাদের মাঝে পূর্ব-আত্মীয়তার বন্ধনও ছিল। হযরত আমার দাদীকে মামী বলতেন। আব্বাজান হয়তো কোন দিক থেকে হযরতের মামাতো ভাই ছিলেন। হযরতুল আল্লামকে আমাদের খান্দানের সবাই ভালোবাসার আতিশয্যে 'ফুল আব্বা' বলতেন, আর হযরতের আহলিয়াকে 'ফুল আম্মা' বলে ডাকতেন। তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। হযরতের ভাই জনাব মরহুম ফজলে হক ফজলী দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। জাগতিক শিক্ষাও যৎসামান্য অর্জন করেছিলেন। তিনি দেওবন্দের ডাকখানার অফিসার পদে চাকুরী করতেন। তারই এক কন্যাকে আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ. দত্তক এনেছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব অত্যন্ত যোগ্য আলেমে দীন ছিলেন।

হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর ইন্তেকালের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সাহেব তার দাফনের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হযরতের কবরের পাশে বিশাল আয়তনের একটি জায়গা খালি ছিল। আব্বাজানের লক্ষ্য ছিল, হযরতের মাকবারার পাশে তার শান মোতাবেক একটি দারুল উলূম গড়ে উঠুক। অপরদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরতের ত্যাগ ও সংগ্রাম এবং হিন্দুস্তানে ছেড়ে আসা তার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি ও অন্যান্য কুরবানীর দিকে তাকালে মনে হয়, হযরতের স্ত্রী ও দত্তক নেয়া সন্তানের স্থায়ী বসবাসের জন্য কোন উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থাও করা দরকার। সুতরাং আব্বাজান রহ. হযরতের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে একটি আবেদন লিখে রাষ্ট্র বরাবর পেশ করলেন যে, হযরতের স্মরণে তার মাকবারার পাশে একটি দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং হযরতের পরিবার-পরিজনের জন্য স্থায়ী প্লট বরাদ্দ দেয়া হোক। এই আবেদনটি পরিবারের কয়েকজনের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারী কাজে যা হয় আর কি! আবেদনটি কয়েক বছর হিমাগারে পড়ে রইল। ইতোমধ্যে নানোকওয়াড়ায় দারুল উলূমের স্থায়ী জায়গার বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না; আরও বড় জায়গার প্রয়োজন দেখা দিল। আব্বাজানকে পরামর্শ দেয়া হলো, যেহেতু আবেদনটি নিছক কতিপয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে রাষ্ট্র বরাবর করা হয়েছিল, ফলে এখনও পর্যন্ত হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর মাকবারা সংলগ্ন জায়গার কোন সুরাহা হয়নি, কাজেই এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী রেজিস্টারভুক্ত দারুল উলূমের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র বরাবর একটি দরখাস্ত পেশ করা হোক। এতে হয়তো বিষয়টির দ্রুত সুরাহা হবে। সেমতে আব্বাজান রহ. হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর পরিবার-পরিজনকে জানিয়ে দারুল উলূম নানকওয়াড়ায় করাচীর চীফ কমিশনারকে আমন্ত্রণ জানালেন, যেন তিনি নিজেই দারুল উলূমের জায়গার সংকীর্ণতা দেখে নেন এবং প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। চীফ কমিশনারের আগমনের দিন হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানীর পরিবার-পরিজনও উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে সে বৈঠকে মৌখিকভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, হযরতুল আল্লামের স্মরণে সেখানে দারুল উলূমের নামে একটি জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে এবং হযরতের পরিবার-পরিজনের জন্যেও আলাদাভাবে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। ১৯৫৩ সনের ৩ জুলাই ফের করাচীর চীফ কমিশনার বরাবর আরেকটি দরখাস্ত দেয়া হয়। সেটাও হযরতের পরিবারের সদস্যরা জানতেন। অপরদিকে সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

পরবর্তী সময় যখন জানা গেল, এই জায়গাটি সিটি কর্পোরেশন-এর সিদ্ধান্ত ছাড়া নেয়া সম্ভব নয় তখন ১৯৫৪ সনের

৫ জানুয়ারী সিটি কর্পোরেশন বরাবর আরেকটি দরখাস্ত দেয়া হয়। সেখানে দারুল উলূমের জন্য জায়গা দেয়ার কথা ছাড়াও হযরতের স্ত্রী, দত্তক নেয়া কন্যার স্বামী এবং হযরতের ভাই প্রত্যেককে আটশত গজ করে প্লট দেয়ার আবেদনও ছিলো। এছাড়াও হযরতের দূরবর্তী সম্পর্কের আরো পাঁচজন আত্মীয়ের নামও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশেষে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৯৫৪ সনের ৩ মে সিটি কর্পোরেশনের স্ট্যান্ডিং কোম্পানী আবেদন মঞ্জুরির সুপারিশ করে এবং ২৩ জুলাই ১৯৫৪ সনে সিটি কর্পোরেশনের ল্যান্ড ম্যানেজার অফিস কর্তৃক কিছু শর্তের ভিত্তিতে আবেদনটি গৃহীত হয়।

হযরত আব্বাজান রহ.-এর পক্ষ থেকে সে সব শর্ত পূরণের স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর ১৬ নভেম্বর ১৯৫৪ সনে সিটি কর্পোরেশন তার সিদ্ধান্ত নং ৪৮৬-এর অধীনে উভয় বিষয়ের যথারীতি মঞ্জুরি দিয়ে দেয়। সে ভিত্তিতে ষোলহাজার দুইশত গজ দারুল উলূমকে এবং দুই হাজার আটচল্লিশ গজ হযরতুল আল্লামের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া হয়েছিল। দারুল উলূমকে যে জায়গাটি দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল লিজ হিসেবে। তখন এটিও বলা হয়েছিল যে, লিজের যাবতীয় শর্ত পূরণ না করা হলে সরকার যে কোনো সময় এই জায়গা ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আবাসস্থল হিসেবে যে প্লট স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া হয়েছিল সেটি স্থায়ী মালিকানার সাথে দেয়া হয়েছে। যদিও সেখানে হযরত আব্বাজানকে দারুল উলূমের সদর হিসেবে এবং মাওলানা নূর আহমদ সাহেবকে দারুল উলূমের নায়েম হিসেবে যথাক্রমে আটশত এবং পাঁচশত গজের প্লট দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু হযরত আব্বাজান রহ. সে প্লট নিজের জন্য নিতে অস্বীকৃতি জানান। সুতরাং তিনি তাকে এবং মাওলানা নূর আহমাদ সাহেবকে যে প্লট দেয়া হয়েছে সেটিও দারুল উলূমকে দিয়ে দেয়ার জন্য দরখাস্ত করেন।

আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এসব কাগজপত্র করাচীর চীফ কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। চীফ কমিশনার মঞ্জুরি দিয়ে সেখানে এ-ও লিখে দিয়েছিলেন যে, ষোল হাজার দুইশত গজ জায়গা দারুল উলূমকে দেয়া হলো। এছাড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হযরতের স্ত্রী, জামাতা ও ভাইয়ের জন্য যে প্লট নির্ধারণ করেছে তারও মঞ্জুরি দেয়া হলো। কিন্তু যে প্লট দারুল উলূম করাচীর সদর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এবং নূর আহমদ সাহেবের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যেহেতু তারা স্বেচ্ছায় তা বাতিলের আবেদন করেছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে দারুল উলুমকেই তা দেয়া হলো। তবে হযরতুল আল্লামের দূরসম্পর্কের পাঁচ আত্মীয়কে প্লট দেয়ার ব্যাপারে যে আবেদন এসেছিল তা গৃহীত হয়নি। (এ সকল কাগজপত্র আজও দারুল উলূম সংরক্ষিত আছে।)

আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আব্বাজান রহ. সেখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে দিলেন এবং সেখানে দারুল উলূম করাচীর বিলবোর্ড স্থাপন করলেন। হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা অনন্য কর্মদক্ষতা এবং মুশকিল কাজকে সহজে সম্পাদনের অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছিলেন। এই জমিটি মঞ্জুরীর জন্য তিনি দিনরাত একাকার করে দিয়েছিলেন এবং মঞ্জুরি পাওয়ার পর সেখানে কিছু অস্থায়ী কামরাও দ্রুত নির্মাণ করে ফেললেন যেন নির্মাণকাজ তদারক করা সহজ হয়। অতঃপর সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য তিনি টেলিফোনের ব্যবস্থা করলেন এবং প্রয়োজনমাফিক বিদ্যুৎ সংযোগও নিয়ে নিলেন।

হযরত আব্বাজানের ইচ্ছে ছিল, মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক নির্মাণকাজ দেশের বুযুর্গ ওলামায়ে কেরামকে দিয়ে শুরু করাবেন। সেমতে তিনি লাহোর থেকে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব, হযরত মাওলানা ইদিরীস কান্ধলভী ছাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ আলী ছাহেব লাহোরীকে দাওয়াত করেন। এছাড়া মুলতান থেকে হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ ছাহেব এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে হযরত মাওলানা আতহার আলী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানান। অতঃপর ১৩৭৪ হিজরী, জুমাদাল-উখরার ২৬ ও ২৭ তারিখ মোতাবেক ২০,২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সনে রবিবার এবং সোমবার দুই দিনব্যাপী সম্মেলন আহ্বান করা হলো। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই সম্মেলনে নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপনেরও কথা ছিলো।

দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব ছাহেবকেও আব্বাজান পত্র মারফত সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জবাবে হযরত লিখেন-

"দফতরে দারুল উলূম দেওবন্দ, জেলা, সাহারানপুর

আমার শ্রদ্ধাভাজন ভাই! আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাক!

আসসালামু আলাইকুম!

পর সমাচার!

প্রথমত এই সুসংবাদ শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। ইতোমধ্যে আমি কয়েকটি দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। যেগুলোর কিছু তো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আরও কিছু প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে আছে। এগুলো নিয়ে দায়িত্বশীলগণ উচ্চাশা লালন করছেন। এ সকল দারুল উলূম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানীর নাম ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় হলো এসব প্রতিষ্ঠানে তার নাম ব্যবহারের প্রতি আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিলো না। আমার দিল তো বলছিলো, তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে যদি কোন দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেটা কেবল মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব প্রতিষ্ঠা করবেন। আপনি যখন দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ দিলেন এবং এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত পত্র আমার হস্তগত হয়েছে তখন এই ভেবে আমার হৃদয়রাজ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলো যে, এখনই সত্যিকারার্থে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং খুব দ্রুতই এই মিশন এগিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে অধমের স্বপ্ন ও কল্পনা বাস্তবে রূপ নিবে ইনশাআল্লাহ।

পাশাপাশি মনের মণিকোঠায় বারবার এই ভাবনা উঁকি দিচ্ছিলো যে, দারুল উলূম ঠিক সেখানেই প্রতিষ্ঠা হোক যেখানে হযরতুল আল্লাম চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। আমার তো সেই জায়গাটিকে দেখে ভীষণ লোভ হতো যে, এটি যেন দারুল উলূমের জন্যই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে! আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া, তিনি আজ আমাকে সেই প্রতীক্ষিত সুসংবাদ শুনিয়েছেন। বস্তুত পরিকল্পনা যেন আজ তার সত্যিকার পরিকল্পকের হাতে এসেই ধরা দিয়েছে। দারুল উলূম ঠিক সেখানেই পৌঁছেছে যেখান থেকে প্রতিনিয়ত রূহানী ফুয়ূয ও বরকতে সিক্ত হতে থাকবে।

দারুল উলূম দেওবন্দও প্রথমে এভাবেই পথচলা শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে ভবন নির্মাণ হয়েছিল। সেই একই চিত্র ও বাস্তবতা দারুল উলূম করাচীর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। উভয়ের মাঝে এমন কাকতালীয় সাদৃশ্য একটি শুভলক্ষণ হিসেবে নেয়া যায়। হিন্দুস্তানের দারুল উলূম যদি সময়ের একঝাঁক প্রথিতযশা মুখলিস আলেম কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ করে

থাকে তবে বলতে হবে এই দারুল উলূমও তার সত্যিকার যোগ্য উত্তরাধিকাররা প্রতিষ্ঠা করছেন, যারা ইলম ও আমলের দিক থেকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী।

আমার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে এই বরকতময় সম্মেলনে অংশগ্রহণের। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি চাইলেও অনেক কিছু সম্ভবপর হয় না। সময়ের কাছে সবসময় আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। তবুও আমাকে স্মরণ রাখার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এবং দারুল উলূমের অন্যান্য সবাইকে কবুল করে নিন। সবাই মিলে পুরখুলূস দু'আ করতে থাকুন। আর চেষ্টা তো দিলের জযবা ও জ্বলন অনুযায়ী হয়ে থাকে। খলীফাজী'র খেদমতে সালাম আরয করছি। বাচ্চাদের জন্য আন্তরিক দু'আ রইল এবং আম্মা সাহেবা ও ভাবীজানের খেদমতেও সালাম ও দু'আর দরখাস্ত করছি।

ওয়াসসালাম-
মুহাম্মদ তৈয়্যব,
দারুল উলূম দেওবন্দ,
সাতাইশ, পাঁচ, ১৩৭৪ হিজরী।"

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী ছাহেব লিখেছেন–

"মুহতারাম দা.বা.

আসসালামু আলাইকুম!

আপনার পত্র পেয়ে সীমাহীন খুশি হয়েছি। মনেপ্রাণে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ। (আলোচনার জন্য) অনুগ্রহপূর্বক যদি কোন বিষয় নির্ধারণ করে দিতেন প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারতাম! ফারুকে আযমের মতো ব্যক্তি যখন বলেন– زورت في نفسي مقالة (আমি মনে মনে আলোচনাটি সাজিয়ে নিয়েছি।) সে ক্ষেত্রে আমরা তো কোন ছার্! দ্বিতীয় কথা, সম্মেলন যদি হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানীর মাকবারা-সংলগ্ন হয় সেটা উত্তম হবে। তৃতীয় কথা, এই নাচিযকে দুই দিনের মধ্যে ফারেগ করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব, যেন অন্যান্য কাজও করতে পারি। আপনার জবাবের প্রতীক্ষায় থাকবো।

ওয়াসসালাম-
মুহাম্মাদ ইদরীস গুফিরা লাহু।"

হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেব লিখেছেন–

"দফতরে মাদরাসা আরাবিয়া খাইরুল মাদারিস মুলতান, পাকিস্তান।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা.!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

আশাকরি আল্লাহর মেহেরবানীতে ভালো আছেন। পর সমাচার– ফেব্রুয়ারী মাসে এতোটা দীর্ঘ সফর মুশকিল মনে হচ্ছে। তারপরও যেহেতু মূলনীতি আছে– الضرورات تبيح المحظورات (ঠেকাবশত নিষিদ্ধ কাজও অনুমোদিত হয়ে যায়।) এই মূলনীতির উপর আমল করত ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫, শুক্রবার পাঞ্জাব থেকে রওয়ানা হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার করাচী পৌঁছবো ইনশাআল্লাহ। করাচী পৌঁছে মাদরাসাতুল ইসলাম সিন্ধ-এ মৌলবী আফতাব আহমাদ ছাহেবের ওখানে অবস্থান করবো। অতঃপর আপনার খেদমতে যে কোন সময় হাজির হয়ে যাবো। আপনি ইস্তিকবালের কোন চিন্তা-ফিকির করবেন না।

ওয়াসসালাম-
দু'আর ভিখারী, আহকার খায়র মুহাম্মাদ
উফিয়া আনহু, মুলতান।
১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ ঈসায়ী।"

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব লাহোরী রহ. লিখেছেন-–

"আনজুমান খুদ্দামুদ্দীন,

শেরানওয়ালা দরওয়াজা, লাহোর।

মাখদূমুল উলামা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব দা.বা.!

আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার জন্য জমিনের বন্দোবস্ত হওয়া একটি বিশাল নেয়ামত। ইনশাআল্লাহ মুসলমানদের জন্য এই জমিন হিদায়াতের যরিয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা আপনার জীবদ্দশায় দারুল উলূমকে পূর্ণতা দান করুন এবং সবসময় আপনার ফুয়ূয ও বারাকাত থেকে ছাত্রদেরকে পরিতৃপ্ত করুন। কেয়ামত অবধি এই জমিন থেকে মকবুল উলামায়ে কেরাম জন্ম লাভ করুন। ব্যক্তিগত অপারগতার কারণে বান্দা হাজির হতে অক্ষম। হযরতের খেদমতে ক্ষমার দরখাস্ত করছি!

আহকারুল আনাম আহমাদ আলী উফিয়া আনহু।"

হযরত আব্বাজানের উস্তাদ হযরত মাওলানা রসূল খান ছাহেব লিখেছেন–

"জনাব মাওলানা ছাহেব দা.বা.!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যময় সংবাদ। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দীনী-দুনিয়াবী সব রকমের অগ্রগতি-উন্নতি নসীব করুন। আমীন!

আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত। বরং নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি। আপনার হয়তো আমার মেয়ের (বিয়েশাদীর) ব্যাপারে জানা আছে। ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ ঈসায়ী তারিখে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে এই বরকতময় মজলিসে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। আপনি রাহাখরচ পাঠাবেন না। সবকিছু ঠিক থাকলে আমি এমন বরকতময় অনুষ্ঠান থেকে মাহরূম হতে চাই না। আমাকে স্মরণ করার জন্য অসংখ্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা। মুহতারাম জনাব হাজী ওয়াজিহুদ্দীন ছাহেবকে আমার সালাম বলবেন।

ওয়াসসালাম–
মুহাম্মাদ রসূল খান উফিয়া আনহুর
রহমান।"

ইমামুল আছর হযরতুল আল্লাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর ছাহেবযাদা হযরত মাওলানা আযহার শাহ কায়সার ছাহেব লিখেছেন–

"মুহতারাম হযরত দা.বা.!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

দারুল উলুম করাচীর সম্মেলনের দাওয়াতনামা পেয়েছি। অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভবন নির্মাণ সম্পর্কীয় ঘোষণা মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আমার খেয়াল সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আসলে আমি আর কী খেয়াল পেশ করবো! তবে এতোটুকু অবশ্যই আরয করব যে, একসময় দেওবন্দী জামা'আতের একটি অংশ দীন প্রচারের তাগিদে আলাদা হয়ে গুজরাট ও কাঠিয়াওয়াড় পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। সেখান থেকে এই জামা'আত আফ্রিকা পর্যন্ত দীনের দাওয়াত নিয়ে অবিরাম ছুটে চলেছে। এখন যেন দ্বিতীয়বার তার আরেকটি অংশকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তারা যেন নবপ্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটিকে (পাকিস্তানকে) ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

কতোই না সৌভাগ্যবান সেই জমিন যেটা মাওলানা উসমানীর জন্য স্বীয় বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং সৌভাগ্যবান সেই জমিন যেখানে মাওলানা মুফতী শফী ছাহেবের মত ব্যক্তিত্ব কাজের সূচনা করছেন! পাকিস্তানবাসী চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, সেখানে দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কতো মহৎ একটি কাজ হচ্ছে। এই কাজে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের সাধ্যমত অংশগ্রহণ করা উচিত। আশা করি আপনার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো আছে।

মুহতারামা আম্মাজান আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

ওয়াসসালাম-

সায়্যিদ মুহাম্মদ আযহার শাহ কায়সার।"

সুতরাং যারা আসার ওয়াদা করেছিলেন তারা সবাই এসেছেন। সম্মেলনে বড়দের অংশগ্রহণের পাশাপাশি দারুল উলূমের শিক্ষার্থীরাও বক্তব্য রেখেছেন। আমার বয়স তখন ১২ বছর। আমাকে দিয়ে আমার উস্তাদ আহমদ আল আহমদ অত্যন্ত মেহনত করে একটি আরবী বক্তব্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন। সম্ভবত ছাত্রদের একটি আরবী কথোপকথনের মাঝে আমাকেও শামিল করেছিলেন। বয়স স্বল্পতার দরুন আমার আরবী বক্তব্যের পর অতিথিবৃন্দের পক্ষ থেকে অনেক উৎসাহ ও বাহ্বা পেয়েছিলাম।

২০ ফেব্রুয়ারী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ছিলো। সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত জনাব আব্দুল হামীদ আল খতীব সভাপতি ছিলেন। তিনি নিজেও বড় মাপের আলেম ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ ছাহেব সভাপতি ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারী সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন ছিলো। এর সভাপতি ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান ছাহেব। আর চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন হযরত মাওলানা আতহার আলী ছাহেব।

এছাড়াও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী, হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরী ছাহেব, কোয়েটা থেকে খলীফা আব্দুল হক সাহেব, সো'বা-সারহাদ থেকে হযরত মাওলানা শের মুহাম্মদ ছাহেবও সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্য থেকে সরদার আব্দুর রব নিশতার ছাহেব, আবু হুসাইন সরকার এবং ড. মালেক ছাহেব, পার্লামেন্টের স্পিকার জনাব মৌলবী তমীযুদ্দীন ছাহেব, শামের রাষ্ট্রদূত জনাব জাওয়াদ আল-মুরাবিত ছাহেব রহ.-ও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দৈনিক জঙ্গ পত্রিকায় সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশ

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ ঈসায়ী দৈনিক জঙ্গ পত্রিকায় সেই সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। সংবাদটির শিরোনাম ছিলো–

"দারুল উলূমের জন্য ৯৩ হাজার টাকার অনুদান ঘোষণা।" (বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–)

করাচী, ২০ ফেব্রুয়ারী।

আজ সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত সায়্যিদ আব্দুল হামীদ আল-খতীবের সভাপতিত্বে দারুল উলূম করাচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে করাচী ও পার্শ্ববর্তী শহরের বিপুল সংখ্যক দীনপ্রিয় মানুষের সমাগম ঘটে। এছাড়াও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম তাশরীফ এনেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান লাহোরী, মাওলানা খায়র মুহাম্মদ মুলতান, খলীফা আব্দুল হক কোয়েটা, মাওলানা আতহার আলী, সভাপতি নেজামে ইসলাম পার্টি পূর্ব পাকিস্তান। এছাড়া স্থানীয় উলামায়ে কেরামও এতে বিপুল উৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত জনাব জাওয়াদ আল-মুরাবিত, স্পিকার মৌলভী তমীজুদ্দীন খান এবং (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) সরদার আব্দুর রব নিশতার ছাহেবও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও কারিকুলামে আরবী চর্চাকারী শিক্ষার্থীরা এতে আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাদের বক্তৃতা শ্রোতাবৃন্দ তন্ময় হয়ে শোনেন এবং সীমাহীন মুগ্ধ হন।

সভাপতি ছাহেব তার বক্তৃতায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান এবং আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বক্তব্য চলাকালীন তাঁকে বারবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায়। তিনি দীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলতের কথা উল্লেখ করে দারুল উলূমের সাফল্যের জন্য প্রাণভরে দু'আ করেন।

করাচীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আব্দুল লতীফ বাওয়ানী দারুল উলূমের নির্মাণফান্ডে ৯৩ হাজার টাকা অনুদানের ঘোষণা দেন। সভাপতির ভাষণের আগে মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী ছাহেব, শাইখুল হাদীস জামি'আ আশরাফিয়া লাহোর এবং উস্তায আহমাদ আল আহমাদ শামী বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গতকাল ইশার পর। তৃতীয় অধিবেশন আজ দুপুর ২:৩০ থেকে ৫ টা পর্যন্ত চলবে এবং চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আজ ইশার পর। এতে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বক্তব্য রাখবেন।

দৈনিক জঙ্গ, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ ঈসায়ী।"

একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত

কিন্তু হঠাৎ করেই একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেলো। হযরতুল আল্লাম শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারা যেন গুজব ছড়িয়ে দিলো যে, মুফতী মুহাম্মদ শফী ছাহেব আপনাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন! হযরতুল আল্লাম রহ.-এর মাকবারা-সংলগ্ন জমিতে তো আপনাদেরই অগ্রাধিকার বেশি! সুতরাং মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব আপনাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন! আপনাদের উচিত তাঁকে প্রতিহত করা। যারা এ গুজবে হাওয়া দিয়েছে এবং রঙ চড়িয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করেছে, আজ তাদের তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়া মুনাসিব মনে হয় না। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় চলে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরোপুরি ক্ষমা করে দিন। কিন্তু, শেষ তক্ ব্যাপারটা এই পর্যন্ত গড়াল যে, হযরত শাইখুল ইসলাম রহ.-এর মুহতারামা স্ত্রীকে পর্যন্ত এতে জড়িয়ে ফেলা হলো! অথচ তিনি ছিলেন একান্তই একজন গৃহিণী; দুনিয়াবী বিষয়াশয়ের সঙ্গে তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। একপর্যায়ে তাঁরও কান ভারি করা হলো। তাঁর নামে দৈনিক জঙ্গ পত্রিকায় একটি চিঠিও প্রকাশ করা হলো। এমনকি আব্বাজান রহ.-এর বিরুদ্ধে পোস্টারিং করা হলো!

আব্বাজান রহ. যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, তিনি নিজে হযরতুল আল্লাম রহ.-এর মুহতারামা স্ত্রীর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁর সামনে প্রকৃত বিষয় ও বাস্তবতা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তেমন একটা সফল হয়েছেন বলে মনে হয় না। হযরতুল আল্লাম রহ.-এর স্ত্রী অত্যন্ত সরলপ্রাণ ছিলেন এবং গৃহস্থালী ব্যস্ততাই ছিল তার মূল কাজ। মূলত তাঁর অন্তরে একরকম অবিশ্বাস দানা বেঁধে গিয়েছিল। ফলে তিনি কোন ইতিবাচক উত্তর দিতে পারছিলেন না। শেষ তক্ পরিস্থিতি এতোটাই নাযুক হয়ে গেলো যে, পত্রিকা মারফত ঘোষণা দেয়া হল, মাদরাসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেখানে হয়েছিলো তিনি সশরীরে সেখানে হাজির হয়ে এর প্রতিবাদ করবেন।

আমি পূর্বে লিখেছি, চীফ কমিশনারকে যখন দারুল উলূমে ডাকা হয়েছিলো, তখন হযরতুল আল্লাম উসমানী রহ.-এর আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিলো যে, এই জমি দারুল উলূমের নামে বরাদ্দ দেয়া হোক। পরবর্তী সময়ে ৩ জুলাই ১৯৫৩ ঈসায়ী তারিখে চীফ কমিশনার বরাবর যে দরখাস্তটি দেয়া হয়, এটাও হযরতুল আল্লাম রহ.-এর আত্মীয়-স্বজনের জানা ছিলো। তখনও পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপত্তি তোলা হয়নি। এভাবে তাদের

সামনেই একে একে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সকল ধাপ যখন শেষ পর্যায়ে উপনীত ঠিক তখনই তাদের পক্ষ থেকে আকস্মিক আপত্তি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়।

মাদরাসার নির্মাণকাজ মুলতবী ঘোষণা

হযরত আব্বাজান রহ. যখন একথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি নির্দ্বিধায় এমনই এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যা বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি বাস্তবতায় কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তিনি নিঃসংকোচে ঘোষণা করলেন– আমার মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কেবলই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী হাসিল করা; এটা কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং আমি আমার মুহতারাম উস্তাযের স্ত্রীকে নারাজ করে কিছুতেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। অতএব এই সম্মেলনে দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথা হবে না। হ্যাঁ, দূর-দারাজ থেকে দেশসেরা মুরুব্বীব উলামায়ে কেরাম ও দীনী ব্যক্তিবর্গ যেহেতু ইতোমধ্যে সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাশরীফ এনেছেন, তাই সম্মেলন যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। যেন এ সকল বুযুর্গানে দীনের নসীহত দ্বারা সর্বসাধারণ উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর এ সম্মেলনে করা হবে না। বরং এ সম্মেলন নিছক সাধারণ বার্ষিক মাহফিলরূপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সময়ে যতক্ষণ পর্যন্ত হযরতের মুহতারামা স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও সম্মতিক্রমে এ বিতর্কের অবসান না ঘটবে, এখানে মাদরাসার সবধরনের কার্যক্রম মুলতবী থাকবে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক 'নঈ রৌশনী' পত্রিকার প্রতিবেদন।

সম্মেলন সম্পর্কে ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ ঈসায়ী তারিখের দৈনিক নঈ রৌশনী পত্রিকা যে প্রতিবেদন করেছিলো তা নিম্নরূপ–

"দীন ও মিল্লাতের সেবাবিমুখ ব্যবসায়ীরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী। দারুল উলূমের সম্মেলনে আরবী ভাষার শিক্ষাদান ও তার ব্যাপক জাগরণ সম্পর্কে মতবিনিময়।

করাচী ২২ ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব প্রতিবেদক) পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে আল-আযহার ইউনিভার্সিটির কারিকুলামে সুবিশাল ইসলামী বিদ্যালয় দারুল উলূমের নতুন ভবন উদ্বোধনের ঘোষণা। ভবনটি শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর নামে নির্মাণের পরিকল্পনা। মহাসম্মেলনে এই ঘোষণা পাঠ করে শোনান পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদীর মহামান্য রাষ্ট্রদূত সায়্যিদ আব্দুল হামিদ আল-খতীব। এই অনুষ্ঠানে গোটা পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা আতহার আলী ছাহেব, সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টি পূর্ব পাকিস্তান। মাওলানা খাইর মুহাম্মাদ ছাহেব মুলতান। মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব পাঞ্জাব। শাইখুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী লাহোর। শাইখুল কুররা কারী হামিদ হুসাইন। হযরত খলীফা আব্দুল হক ছাহেব বেলুচিস্তান। হযরত মাওলানা শের মুহাম্মাদ সো'বা-সারহাদ প্রমুখ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও স্পিকার মৌলভী তমীজুদ্দীন খান, সরদার আব্দুর রব নাশতার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল হুসাইন সরকার, ড. মুত্তালিব মালিক, সায়্যিদ আমীন আল মিসরী, মহামান্য সিরীয় রাষ্ট্রদূত, শেঠ আব্দুল লতীফ বাওয়ানী, মিস্টার এ.এম. কুরাইশী, সাবেক সভাপতি মুসলিম লীগ ও সভাপতি 'ইখওয়ানে পাকিস্তান অতিথিদের মাঝে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ মতীন আল খতীব অনুষ্ঠানসূচী পেশ করেন এবং সংক্ষিপ্ত বার্ষিক কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। এতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়, এই দারুল উলূম হযরত শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-এর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠানরূপে একটি ট্রাস্টের অধীনে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই ট্রাস্টের মুতাওয়াল্লী থাকবেন শেঠ বাওয়ানী, হাকীম হাফেজ মুহাম্মাদ সাঈদ; স্বত্বাধিকারী হামদর্দ দাওয়াখানা; খান বাহাদূর ফজলে কারীম, খান বাহাদুর হাজী ওয়াজীহুদ্দীন, শেঠ হাজী শরীফ, হাজী ইবরাহীম ও মুফতী মুহাম্মাদ শফী। এটি একটি রেজিস্টারভুক্ত ট্রাস্ট এবং পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে শুল্কমুক্ত প্রতিষ্ঠান। এই ট্রাস্টের জমি অনারেবল চীফ কমিশনারের সুপারিশক্রমে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এই রেজিস্টার্ড ট্রাস্টের নামে বরাদ্দ দিয়েছে। সরকার এই জমি দারুল উলূমকে দেয়া ছাড়াও এখান থেকে আলাদাভাবে আটশো গজ জমি শাইখুল ইসলাম রহ.-এর বিধবা স্ত্রীকে এবং আটশো গজ শাইখুল ইসলাম রহ.-এর ভাইকে অনুদানরূপে প্রদান করেছেন।

অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। আরবী ভাষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের যে পরিকল্পনা ও উদ্যোগ দারুল উলূম গ্রহণ করেছে তার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন বক্তা আরবিতে বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইলমে দীনের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি মুসলমানদেরকে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা। সৌদি রাষ্ট্রদূত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তাওহীদ ও একত্ববাদ বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদাকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতি জোর তাগিদ দেন। দারুল উলূম সম্পর্কে তিনি বলেন, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।

প্রথম দিনের অধিবেশন শেষে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। তাতে জানানো হয়, আল্লামা উসমানী রহ.-এর সহধর্মিণীর কয়েকটি প্রস্তাবনা ট্রাস্টের বিবেচনাধীন থাকায় ভিত্তিস্থাপনের কাজটি আপাতত মুলতবী করা হচ্ছে। শেঠ হাজী আব্দুল লতীফ বাওয়ানী দারুল উলূমের নির্মাণফান্ডে ৯৩ হাজার রুপী দান করেন। ইতোমধ্যে নির্মাণকাজও শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং এতে ৮ হাজার রুপী খরচও হয়ে গেছে। এই ইসলামী রাষ্ট্রে যে সুবিশাল ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের সূচনা হয়েছে, আশা করা যায় শীঘ্রই তা পূর্ণতা লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ। শেঠ বাওয়ানী বলেন, আমি একজন ব্যবসায়ী। একজন ব্যবসায়ীর জন্য এটা অবশ্যকর্তব্য যে, আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত তাকে দান করেছেন তার দ্বারা সে নিজ দীন ও রাষ্ট্রের খেদমত করবে। কোনও ব্যবসায়ী যদি এই দায়িত্ব আদায় না করেন, তবে তা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার শামিল। উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য বক্তারা আরবী ভাষার ব্যাপক প্রচারের উপর জোর দেন। তারা বলেন, পাকিস্তানী মুসলিমদের জন্য আরবী ভাষা জানা অত্যন্ত জরুরী।

দৈনিক নঈ রৌশনী, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ ঈসায়ী।"

যাহোক, হযরত আব্বাজান রহ.-এর মুখে এই জমিতে দারুল উলূমের নির্মাণকাজ মুলতবীর ঘোষণা শুনে উপস্থিত সবাই হতচকিত হয়ে পড়েন। কতক্ষণের জন্য গোটা সমাবেশস্থলে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। তারা বলেন, এ জমি তো দারুল উলূমের নামেই বরাদ্দ দেয়া হয়ে গেছে। আইনত কারও জন্য এখন আর কোনোরকম আপত্তি তোলার অবকাশ নেই। সরকারী দপ্তর ও প্রশাসনও একথা নিশ্চিত করেছে যে, আমরা একাজে

আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবো। ওদিকে ভবনের যাবতীয় প্ল্যানও যথারীতি পাশ হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি কামরাও তৈরি করা হয়ে গেছে। হাজী আব্দুল লতীফ বাওয়ানী সাহেব নির্মাণকাজের জন্য ৯৩ হাজার রুপী অনুদানের ঘোষণাও করেন। তাছাড়া সারাদেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরামও এখানে উপস্থিত আছেন। তাদের উপস্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকের এই উদ্বোধনী সম্মেলন বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে নানকওয়াড়ার জায়গাটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সবাই বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে এই জায়গাটি ছেড়ে দেয়াটা চরম ভুল বোঝাবুঝি ও বদনামীর কারণ হবে। কিন্তু হযরত আব্বাজান রহ. তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় যে, আমি এই পরিস্থিতিতে ভিত্তি স্থাপন করতে পারি না। আমার মুহতারাম উস্তাযের স্ত্রীর সঙ্গে মীমাংসা না করে আমার জন্য কিছুতেই এখানে দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেবের বর্ণনা মতে, আব্বাজান রহ. ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বলে দিয়েছিলেন যে, যেহেতু জমির অ্যালোটম্যান্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে করা হয়েছে, তাই আইন মোতাবেক এখানে নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখার পূর্ণ অধিকার আপনাদের রয়েছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমি এর মধ্যে থাকবো না। আমি আমার মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম নানকওয়াড়াতেই চালাবো, যতদিন না বিবাদহীন নিষ্কণ্টক কোন জমির ব্যবস্থা হয়।

পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ ছাহেব ও খান বাহাদুর ফজলে কারীম ছাহেবকে হযরতুল আল্লাম রহ.-এর আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠানো হয়। হযরতের আত্মীয়-স্বজন তাদের মারফৎ যেসব দাবী-দাওয়া পেশ করেন তার অধিকাংশই আব্বাজান রহ. সানন্দে মেনে নেন। যেমন তাদের প্রথম দাবী ছিল– মাদরাসাটি হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর নামে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা তো ইতোমধ্যে কার্যকরই হয়ে গিয়েছে। তাঁর নামেই মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং যে বিলবোর্ড লাগানো হয়েছিলো তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল– "শায়খুল ইসলাম হযরতুল আল্লাম শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. স্মৃতিপ্রতিষ্ঠান"

তাদের দ্বিতীয় দাবী ছিল, জনাব ফজলে হক ছাহেবকে হযরতুল আল্লাম রহ.-এর মাকবারা ও মাকবারা সংলগ্ন মসজিদের মুতাওয়াল্লী বানাতে হবে। হযরত আব্বাজান রহ. এই দাবীও মেনে নেন। কিন্তু তাদের তৃতীয় দাবিটি ছিল, মাদরাসার ট্রাস্টের নাম পরিবর্তন করে "আল্লামা উসমানী ট্রাস্ট" নামে নামকরণ করতে হবে, যার ট্রাস্টি বা মোতাওয়াল্লী থাকবেন হযরতুল আল্লাম উসমানী রহ.-এর ওয়ারিশগণ। তাদের এই দাবী কোনওক্রমেই মানা সম্ভবপর ছিলো না। কারণ, প্রথমত আইনত তাদের এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ গলদ। একটা ওয়াকফকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীভাবে উত্তরাধিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম নেই। দ্বিতীয়ত, জমির অ্যালোটম্যান্ট হয়েছিলো দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে। সে অ্যালোটম্যান্ট বাতিল না করা পর্যন্ত এ দাবীর বাস্তবায়ন সম্ভব ছিলো না। আর বিদ্যমান অবস্থায় তা বাতিল করা কার্যত অসম্ভবই ছিল বলা চলে। তাছাড়া সরকারী মহলও তাদের এই দাবীর ব্যাপারে সম্মত ছিলেন না। তৃতীয়ত, হযরতুল আল্লাম রহ.-এর ওয়ারিশদের মধ্যে একজনই মাত্র মাওলানা ছিলেন। যার নাম ছিলো মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব। তিনিই একমাত্র আলেম ছিলেন মাদরাসা সম্পর্কে যার আগ্রহ থাকতে পারতো। সুতরাং আব্বাজান রহ. প্রস্তাব করেন যে, তাকে দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হোক। কিন্তু তখনকার সুরতহাল থেকে সহজেই অনুমেয় ছিলো যে, যারা এসব লোককে উস্কানী দিচ্ছিল তাদের উদ্দেশ্য আদৌ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা ছিলো না এবং হযরত রহ.-এর আত্মীয়স্বজনের উপকার করাও তাদের লক্ষ্য ছিলো না। অতএব তাদের সকল যৌক্তিক দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা অব্যাহত ছিলো। আর এদিকে হযরত আব্বাজান রহ. তার এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন যে, কোনও বিরোধ-বিবাদের উপর দাঁড়িয়ে মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন হবে না। বিশেষত স্বীয় উস্তাযের মুহতারামা সহধর্মিণীকে নারাজ করে তো এটা মোটেও সম্ভব নয়।

আব্বাজান রহ. প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস শোনাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق-

অর্থ: আমি জান্নাতের মধ্যভাগে ওই ব্যক্তির জন্য একটি ঘরের দায়িত্বশীল, যে হক ও ন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করে।

আমরা আব্বাজান রহ.-কে সর্বদা এই হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। কিন্তু, এটা তো একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজ অধিকার ছেড়ে দেয়ার চিরাচরিত নীতি রক্ষা করা ছিলো অনেক বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার। এতে আমাদের সকলেরই অন্তর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলো। সেইসঙ্গে সেই করুণ পরিণতিও যেন পরিলক্ষিত হচ্ছিলো যে, এখানে হযরতুল আল্লাম রহ.-এর শান মোতাবেক কোন দারুল উলূম তো গড়ে উঠবেই না বরং এই জমিও হয়তো অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হবে!

সুতরাং যা আশংকা করা হচ্ছিলো বাস্তবে তাই ঘটলো। সে জমিতে শেষ পর্যন্ত কোনও দীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এমনকি হযরতুল আল্লাম রহ.-এর সেই আত্মীয়-স্বজনরাও সেখানে বসবাসের জন্য একটুকরো জায়গাও পাননি। হযরত রহ.-এর ভাইয়েরও মাকবারা ও মসজিদের মুতাওয়াল্লী হবার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বরং তাঁর সে আত্মীয়-স্বজনরা কোনক্রমেই যখন দারুল উলূম প্রতিষ্ঠায় সম্মত হননি এবং শেষ পর্যন্ত হযরত আব্বাজান রহ. সে জমি থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, তখন একপর্যায়ে জমিটি জনাব এ. এম. কুরাইশী সাহেবের দখলে চলে যায়। (কুরাইশী ছাহেবের বাড়িতে হযরত শাইখুল ইসলাম রহ. ও তাঁর মুহতারামা সহধর্মিণী অবস্থান করতেন)। তিনি সেখানে 'ইসলামিয়া কলেজ' নামে একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে অর্থের বিনিময়ে জাগতিক শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এই ইসলামিয়া কলেজের সঙ্গে কোনও রকমেই হযরতুল আল্লাম উসমানী রহ.-এর নামের যোগসূত্র রাখা হয়নি। বছরের পর বছর হযরতুল আল্লাম রহ.-এর মাকবারাও সেই কলেজের সীমানার ভেতরে সম্পূর্ণ বেওয়ারিশ, বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকে! সেখানে পৌঁছাও ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষেরও কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। বহুবছর পর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুম জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক আমার অনুরোধে সেখানে পৌঁছার একটি আলাদা রাস্তা তৈরি করে দেন। এভাবেই মাকবারাটি এখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে এবং ঐ পথ ধরেই তাঁর শিওরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তখন আমাদের মতো কেউ হলে খুব সহজে সে জমি হাতছাড়া করতে চাইতো না। **(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

তাবলীগ জামাতের সিংহপুরুষ

হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান রহ.-এর সোহবত হতে প্রাপ্ত অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার-২

বয়ান লেখক: প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম (আহলে কাকরাইল)

পটভূমি: *আমার পরম সৌভাগ্য যে, ১৯৭৩-১৯৮৭ ঈসায়ী পর্যন্ত প্রায় পনেরোটি বছর তাবলীগ জামাত-এর কিংবদন্তি, কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান ছাহেব রহ.-এর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে হযরতের মুখনিঃসৃত বিভিন্ন বয়ান ও নসীহত যেমন ডায়েরীর পাতায় লিপিবদ্ধ করেছি, তেমনই তাঁর বিভিন্ন আচরণ ও উচ্চারণ স্মৃতির পাতায় সংরক্ষণ করেছি। বস্তুত তিনি ছিলেন দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম সারির মুরুব্বিয়ানে কেরামের তরজুমান-ভাষ্যকার। ছিলেন দাওয়াত ইলাল্লাহর তরে নিবেদিতপ্রাণ 'রিজাল'-সিংহপুরুষ। তাঁর আচরণ ও উচ্চারণ ছিল উম্মতের জন্য অমূল্য রত্নভাণ্ডার। যারা টঙ্গীর ময়দানে কিংবা কাকরাইলের মিম্বরে তাঁর অন্তরাত্মায় করাঘাতকারী বয়ান শুনেছেন তারা অপকটে এর স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য। সেই মহামূল্য রত্নভাণ্ডারের সামান্য ঝলক পাঠকের খিদমতে পর্যায়ক্রমে 'ডায়েরীর পাতা' ও 'স্মৃতির পাতা' শিরোনামে পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।*

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

(নয়)

১৯৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বয়ান হতে

স্থান: কাকরাইল মসজিদ।

তারিখ: ১৮ যিলহজ্জ ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৭ অক্টোবর ১৯৮১ ঈসায়ী। শনিবার, বাদমাগরিব।

লন্ডন ইজতিমায় হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.-কে চার মযমূনে (বিষয়ে) কথা বলতে বলেন– ১. যিম্মাদারী কা ইহসাস। (দায়িত্বের অনুভূতি) ২. উসূল কী পাবন্দী। (তাবলীগী কাজের নিয়ম-নীতি অনুসরণ) ৩. আ-পাস্ কা জোড়। (পারস্পরিক একতা) ৪. কুরবানী কে সাথ্ ওয়াক্ত লাগানা। (ত্যাগ-তিতিক্ষার সঙ্গে সময় লাগানো)

বড় হযরতজী রহ. বলেন, এ কাজের সফলতা উসূলের পাবন্দীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেছেন। সব কাজেরই দরজা আছে। দাওয়াতের কাজের দরজা হলো তার উসূল।

দাওয়াতের মেহনতে ছয়টি গুণের উপর থাকতে হবে– ঈমানী হালত, নামাযের সিফাত, হালের আমর (উপস্থিত কর্তব্য পালন), আল্লাহর ধ্যান, ইকরামে মুসলিমীন, তাসহীহে নিয়ত। তাসহীহে নিয়ত বা নিয়ত বিশুদ্ধকরণের ফলাফল হলো ইখলাস। তাবলীগওয়ালার মনমানসিকতা হবে– আমার মধ্যে ইখলাস নাই, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল; নিজেকে তাবলীগ-জান্তা মনে হয়, কিন্তু না, সহাবায়ে কেরাম জানতেন। দাওয়াত-তাবলীগের ছয় সিফাতের মধ্যে বান্দার হিফাযত নিহিত রয়েছে। আর সাত নম্বর সিফাত হলো, তর্কে লা-ইয়ানী অর্থাৎ অনর্থক কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাপকে গালি দেয়া কবীরা গোনাহ। একজন বললেন, হুযূর! বাপকে কেউ গালি দেয় নাকি? বললেন, অন্যের বাপকে গালি দিলে সে তোমার বাপকে গালি দিবে। ফলে তুমিই যেন তোমার বাপকে গালি দিলে! অনুরূপভাবে অন্যের বাতিল খোদাকে গালি দিলে সে তোমার হক খোদাকে গালি দিবে। ফলে তুমিই যেন তোমার হক খোদাকে গালি দিলে!

(দশ)

১৯৮৬ সালের ২৪ অক্টোবর 'আমার শোনা আখেরী বয়ান' হতে

স্থান : কাকরাইল মসজিদ।

তারিখ: ২৪ অক্টোবর ১৯৮৬। জুমাবার, বাদ ফজর।

(আমি সেদিন তিনদিনের জামাতগুলোর রোখ দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ কানে ভেসে আসল মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব রহ.-এর কণ্ঠ। বয়ানের তীব্র আকর্ষণে তাশকীলের যিম্মাদার মরহুম মুশফিক ভাই রহ. [খিদমাহ হসপিটালের সাবেক এম.ডি]-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পুরো বয়ান শুনে আসি। এরপর অসুস্থতার কারণে কাকরাইলের মিম্বরে হুযুরের আর কোন বয়ান হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বয়ানের অংশবিশেষ আমার লেখা পকেট ডায়েরী হতে পেশ করছি–)

কুরআন হিফাযতের ব্যাপারে উম্মতের চার যিম্মাদারী–

(১) লফযের (শব্দের) হিফাযত। (২) অর্থ-মর্মের হিফাযত। (৩) আমলের হিফাযত। (৪) দাওয়াতের হিফাযত।

একজন আলেম হাজার আবেদ হতে উত্তম। আলেমদেরকে অত্যধিক সর্তক থাকতে হয়। আলেম নফল ছেড়ে দিলে জনসাধারণ ফরয ছেড়ে দিবে। সাহাবায়ে কেরাম বয়ান করতেন অল্প, যুহদ অবলম্বন করতেন বেশি। সাহাবায়ে কেরামের ঐ ইলমও ছিল যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার গায়েবী মদদ চিনতে পারা যায়।

উযূ মুমিনের হাতিয়ার। তবে কোন রকমে করা উযূ হাতিয়ার নয়; সুন্নাত তরীকায় করা উযূ হলো হাতিয়ার। এজন্য– ১. উযূর শুরুতে মিসওয়াক করা। ২. বসে উযূ করা। ৩. কিবলামুখী হয়ে উযূ করা। ৪. উঁচু জায়গায় বসে উযূ করা ইত্যাদি। উযূর একটি সুন্নত ছুটে গেলে জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অল্প অল্প করে হলেও লাগাতার দীনের মেহনতে লেগে থাকা। এতে একসময় ভারি ভারি মেহনতের তাওফীক হবে। দেখেন না, গ্রামাঞ্চলে নতুন মাদরাসার জন্য শুরুর কয়েক বছর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধানের নাড়া (যা জ্বালানীর কাজে লাগে) কালেকশন করে; ধান বা টাকা কালেকশন করে না। কারণ দাতারা শুরুতেই টাকা দিতে রাজি হবে না। শুরুর দিকে ১/২ বছর নাড়া কালেকশন করতে করতে মাদরাসার পরিচিতি হবে। এরপর লোকজন টাকা-পয়সা দিবে। দোস্তো-বুযুর্গ! এখন যারা উসূল মোতাবেক ৩ চিল্লা দিচ্ছে জিহাদের ডাক আসলে তারাই এগিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আর যে ব্যক্তি এখন ৩ দিনও দিতে পারে না, সে ভাগবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনকে খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মুমিনের সঙ্গে খেজুর গাছের একটা মিল হলো, কাটার আগ পর্যন্ত খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। অনুরূপ মুমিনেরও মউত পর্যন্ত আমল ছুটবে না।

কুরআনুল কারীমে জান্নাতের দু'টো গাছের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে– আঙ্গুর ও খেজুর গাছ। কেন? আমলের কথা বুঝাতে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে আল্লাহ তা'আলা বহুত উঁচা স্তরের ইলম দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, সূরা নাছর-এর তাৎপর্য কী? বললেন, এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল ঘনিয়ে আসার ইঙ্গিত রয়েছে।

নিছক চেষ্টা-তদবীরে হবে না, গলদ তদবীরেও হবে না; হবে স্রেফ সহীহ তদবীরে। সহীহ তদবীরের সারসংক্ষেপ হলো দাওয়াত ও দু'আর সমন্বয় ঘটানো। আরেকটু বিস্তারিত বললে দাওয়াত, তা'লীম, যিকির, নামায। ব্যস, যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে এক শিশুকে ঈমান শিখাচ্ছেন– আল্লাহ যদি তোমার উপকার করতে চান কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ যদি তোমার ক্ষতি করতে চান কেউ উপকার করতে পারবে না। ঈমান ও দীনের এই তা'লীম সবার জন্য; ছোট-বড় সবার জন্য।

হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ছিলেন পাক-ভারতের অনেক বড় আলেম। তিনি বয়ান শুরু করলে ফজরের আযান হয়ে যেতো, মজমা টেরও পেত না। এতো বড় আলেমও হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর কাছে এসে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে বললেন, এখনও পর্যন্ত অর্ধেক ঈমানও শিখতে পারিনি।

ইলমে ইলাহী হচ্ছে হাতিয়ার। এক الم (আলিফ-লাম-মীম) এর কাছেই সকল জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরাভূত। জাগতিক বৈধ জ্ঞান-বিজ্ঞানও ফেলনা নয়; তবে সেটা হবে বকদরে জরুরত তথা প্রয়োজন অনুপাতে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এক সাহাবীকে ইবরানী ভাষা শিখতে বলেছিলেন। ইলম সহীহ হওয়াও জরুরী। গাধাকে উজির আর উজিরকে গাধা বলা জাহেলী কাজ।

দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের তরতীব হলো, প্রথমে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করতে হবে। এর দ্বারা পরিবেশ সৃষ্টি হলে পরের ধাপ হলো আমর বিল মারুফ এবং অতঃপর নাহী আনিল মুনকার। দাওয়াত ইলাল্লাহ বা দাওয়াত ইলাল খায়ের-এর কাজ করতে বহুত কষ্ট-মুজাহাদা বরদাশত করতে হবে। এই দুঃখ-কষ্ট আসবে দাঈর তরক্কী ও উন্নতির জন্য। তাকে হালাক ও ধ্বংস করার জন্য নয়। এজন্য দাঈর মধ্যে তাহাম্মুল তথা সহ্য করার সিফাতও থাকতে হবে। দাঈকে হিজরতও করতে হবে। হিজরত অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

দাওয়াতের মেহনত লাগাতার করতে থাকা। পরিবারের সদস্যদের এক-একজন করে পালাক্রমে আল্লাহর রাস্তায় থাকা। যতক্ষণ কাস্টমারের আনাগোনা থাকে দোকান খালি রাখা হয় না। নিজে চলে আসলেও কর্মচারীকে বসিয়ে আসে। কিন্তু দীনকে আমরা দোকানের সমানও গুরুত্ব দেই না।

আজ উম্মতের দিল থেকে রাসূলের তরীকায় হওয়ার ইয়াকীন বের হয়ে গেছে। আমল থেকে হওয়ার ইয়াকীন বের হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে তা শুধুই মৌখিক জমা-খরচ। বৃষ্টি বর্ষণ কিংবা বন্ধ করতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম নয়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম দুই রাকআত নামায পড়ে বৃষ্টির ফায়সালা করিয়ে নিয়েছেন। ইয়া আ'লীমু ইয়া আযীম, ইয়া হালীমু ইয়া কারীম পড়তে পড়তে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. দশ হাজারের লশকর নিয়ে পানির উপর দিয়ে পার হয়ে গেলেন। ইয়াকীন ও আমলের দ্বারাই সবকিছু হবে, তবে জানতে হবে কোন সময় নিজেকে ইস্তে'মাল করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন।

হিজরত দ্বারা নুসরত পয়দা হবে। নুসরত দ্বারা হিজরত পয়দা হবে। আনসার মুহাজিরের সম্মিলিত কুরবানীর ফলে গায়েবী নেযাম সক্রিয় হবে। কাফেররা ইসলাম কবুল করতে শুরু করবে। জনসাধারণ আমলের উপর উঠে গেলে আল্লাহ তা'আলা বাদশাহকে হয়তো হিদায়াত দিবেন নয়তো উল্টে দিবেন। দীনের মেহনত ইখলাসের সাথে করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন। তবে মাঝে-মধ্যে ইস্তেকামাত তথা অটলতার পরীক্ষা আসবে। বান্দা খাঁটি কিনা দুঃখ-কষ্টে ফেলে আল্লাহ পরখ করে নিবেন। তারপর সাহায্য আসবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, কবীরা গুনাহ করনেওয়ালার সাথে আল্লাহর মদদ নেই।

তাবলীগের এই মেহনত 'লুকতা' তথা পথে পড়ে থাকা বস্তুর মতো। অর্থাৎ কুড়িয়ে নিলেই মালিকের খোঁজ করে পৌঁছে দেয়ার যিম্মাদারী এসে যায়।

বাতিলের অন্তরে দাঈর রু'ব (প্রভাব) খুব বেশি হয়ে থাকে। এখনও রাশিয়া তাঁদের কবর হিফাযত করছে। চীন তাঁদের কবর হিফাযত করছে। দাঈর জান কবয করতেও বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার জান কবয করতে বিশেষ ফেরেশতা আসবে। আজ বাতিলের অন্তরে মুসলমানদের কোন প্রভাব অবশিষ্ট আছে কি? নেই। সমস্ত দুনিয়ার মুসলমান মিলেও কি কোন একটা ছোট দেশকে আল্টিমেটাম (চরমপত্র) দিতে পারবে? পারবে না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম সংখ্যায় অল্প হয়েও বড় বড় পরাশক্তিকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন। বলেছেন, 'আসলিম, তাসলাম' অর্থাৎ, ইসলাম কবুল করো, নিরাপত্তা পাবে। নচেৎ কর দিয়ে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নাও, অন্যথায় মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত হও! আনসার-মুহাজির সকলে একত্রিত হওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।

ফেরাউন মন্ত্রী ছিল, আর নমরুদ ছিল বাদশাহ। মন্ত্রীত্ব আর বাদশাহী এই দুই রকম হুকুমত কেয়ামত পর্যন্ত দাঈর মুকাবেলায় থাকবে। দাঈ যদি মুখলিস হয় একটু ইমতিহান (পরীক্ষা) আসবে, তারপর সাহায্য আসবে। ইমতিহান বিভিন্নভাবে আসতে পারে। দুঃখের ইমতিহানও আসতে পারে, সুখের ইমতিহানও আসতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, হাদিয়া নেয়া সুন্নত কিন্তু দাঈর জন্য ইমতিহান। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন রানী বিলকিসকে আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন বিলকিস তখন অত্যন্ত মূল্যবান হাদিয়া পাঠায়। আল্লাহর নবী, দাঈ ইলাল্লাহ সেই হাদিয়া কবুল করেননি। দাওয়াতের ময়দানে দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবেতের কোন পরোয়া করা যাবে না। খাবার নেই তো গাছের পাতা খাবো। এভাবে সবর করে করে মেহনত করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা অন্তরে হিকমত ও প্রজ্ঞার ঝর্নাধারা প্রবাহিত করবেন। এজন্য দিলকে ওয়াসী' (প্রশস্ত) রাখতে হবে। হর-হালতে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে। প্রতিটি মাদরাসা থেকে সর্বদা একজন আল্লাহর রাস্তায় থাকা উচিত। এর জন্য মশওয়ারা করে তরতীব বানিয়ে নেয়া চাই।

(এগার)

কাকরাইলের মিম্বরে আখেরী দু'আ

[ইন্তেকালের ৪ সপ্তাহ পূর্বে ইয়াসীন খতমের পর আখেরী দু'আ]

স্থানঃ কাকরাইল মসজিদ।

তারিখঃ ১৯ মার্চ ১৯৮৭। রবিবার দিবাগত রাত বাদ মাগরিব (তথা সোমবার)।

সারাদেশের তাবলীগের মারকাজ কাকরাইল মসজিদে প্রতিদিন বাদ মাগরিব (রমাযানে বাদ যোহর) আলমী ফিকিরের সাথে সারা বিশ্বের কেয়ামত তক্ আনেওয়ালা উম্মতের জন্য ইজতিমায়ী দু'আ করা হয় এবং আমলটি এখনও চালু আছে। ১৭ মে ১৯৮৭ তারিখ রবিবার হুযূরের ইন্তেকালের মাত্র ৪ সপ্তাহ আগে ১৯ এপ্রিল ১৯৮৭ রবিবার দিবাগত বাদ মাগরিব দু'আ করার ফায়সালা ছিল হুযূরের। হুযূর তখন কঠিন অসুস্থ। হুযূরকে চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় কয়েকজন ধরাধরি করে উপর হতে নামিয়ে এনে মসজিদের দোতলায় মিম্বরে বসিয়ে দেয়ার দৃশ্য যেন আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে।

হুযূর আবেগজড়িত কণ্ঠে কায়মনোবাক্যে ধ্যানের সাথে ১৫ মিনিট ধরে দু'আ করেন। দু'আয় শরীক হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার প্রিয় মুরুব্বীর জীবন্ত ও অভূতপূর্ব সেই দুআর সারাংশ সাথে সাথে ডায়েরীতে লিখে নিয়েছিলাম। দু'আর বাক্যগুলো তামাম উম্মতের খেদমতে নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে–

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله...الخ

لا اله الا الله الحليم الكريم...

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اللهم اهدنا واهدبنا واهدالناس جميعا... الخ

আয় আল্লাহ! আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করো। জেনে-না জেনে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, রাতের অন্ধকারে-দিনের আলোয়, ইজতিমায়ী-ইনফিরাদী, হাত-পা, চোখ-মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কবীরা-সগীরা, হুকূকুল্লাহ-হুকূকুল ইবাদ নষ্ট করে থাকলে তাওবা নসীব করো এবং তওবা কবুল করো। তওবা করে ভঙ্গ করেছি মাফ করো, কবুল করো। দাওয়াতের মেহনতে সুস্তি (অলসতা), গাফলতি, জাহালাতকে মাফ করো। দাওয়াতের মেহনতকে যিন্দা করো। তা'লীমের মেহনতকে যিন্দা করো। যিকির ও ইবাদতের মেহনতকে যিন্দা করো। খিদমতে খালকের মেহনতকে যিন্দা করো।

আয় আল্লাহ! কালিমার হাকীকাত নসীব করো। ইলম ও যিকিরের হাকীকত নসীব করো। হুসনে আখলাক নসীব করো। দিলের মধ্যে খুলুসিয়াত এনায়েত করো। দাওয়াতের ফিকির নসীব করো। উম্মতের দরদ ও ফিকির নসীব করো। দাঈদেরকে কবুল করো। মুরুব্বীদেরকে সাও ফী ছদ কবুল করো। নিযামুদ্দীনওয়ালাদের কবুল করো। রাইবেন্ডওয়ালাদের কবুল করো। কাকরাইলওয়ালাদের কবুল করো। তামাম উম্মতকে হিদায়াত নসীব করো। তামাম মুসলমানকে দাওয়াতের মেহনতের জন্য কবুল করো। যরিয়া হিসেবে আমাদেরকে কবুল করো। আমাদের জান-মাল তোমার দীনের মেহনতে কবুল করো। বিবি-বাচ্চাকে কবুল করো। দাওয়াতের মেহনত করতে করতে তোমার রাস্তায় আমাদের মউত নসীব করো। তোমার রাস্তায় মউত নসীব করো। দাওয়াতের মেহনতকে কেয়ামত তক্ কবুল করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাউযে কাউসারের পানি নসীব করো। সমস্ত মুসলমানকে হিফাযত করো। আমাদের দু'আকে কবুল করো। সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইয্যাতি 'আম্মা ইয়াসিফূন... আলামীন। আ-মী-ন, আ-মী-ন, আ-মী-ন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

দু'আটি করা হয়েছিল আবেগঘন পরিবেশে। দু'আর প্রতিটি বাক্য ছিল আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি ভরা। দু'আটি একটি জামে' দু'আ। এতে জরুরী কোন অংশ বাদ পড়েনি। অসুস্থতার কারণে দু'আর আওয়াজ দুর্বল/হালকা হলেও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সংবলিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত সবল ও শক্তিশালী ছিল। দু'আর মধ্যে হুযূর যখন বলছিলেন– তোমার রাস্তায় মউত নসীব করো– পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল আমাদের জন্য বলার পরপর নিজের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা যাহির করছেন এবং আল্লাহর দরবারে আবদার জানাচ্ছেন। দু'আ শেষে আমি আশপাশের ২/১ মুনাসিব সাথীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি এবং বলি যে, হুযূর সহসা আবুধাবি রওনা হচ্ছেন, মনে হচ্ছে আল্লাহ চাহেন তো সেখানেই শাহাদাত নসীব হবে। এদিকে আমি চিল্লায় চলে গেলাম। চিল্লার মধ্যেই খবর পেলাম দু'আ করার ২৮ দিনের মাথায় ১৮ রমাযান মোতাবেক ১৭ মে ১৯৮৭ সালে হুযূরের শাহাদাত নসীব হয়েছে। আল্লাহ হুযূরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আ-মী-ন।

স্মৃতির পাতা থেকে

মুহতারাম পাঠক! এতক্ষণ 'ডায়েরীর পাতা' থেকে লেখা হলো। এখন 'স্মৃতির পাতা' থেকে লেখা হচ্ছে এমন কিছু শিক্ষণীয় ও আচরণ, যা বিভিন্ন সময় হুযূরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে এবং কিছু এমন কিছু অবিস্মরণীয় উচ্চারণ, যা হুযূরের মুবারক যবান হতে বিভিন্ন সময় উচ্চারিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় আচরণ ও উচ্চারণ

১. একবার হুযূরের জন্য রিক্সা ডেকে দাঁড় করানো হলো। রিক্সার দিকে একনজর তাকিয়েই তিনি সেটিকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে বললেন। কারণ, রিক্সার পেছনে মহিলার ছবি ছিল! এই ছিল হুযূরের তাকওয়া ও খোদাভীতির নমুনা।

২. একবার কাকরাইলে হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক করা ছিল সকাল ০৮.০০ টায়। হাজির হয়ে হুযূরকে শাল মুড়ি দিয়ে ঘুমন্ত পেলাম। জাগ্রত হওয়ার পর বললেন, ০৮:০১ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিছানায় গিয়েছি। এমনই ছিল হুযূরের সময়ের পাবন্দী।

৩. হুযূরের জন্য নাস্তা (পাউরুটি) পেশ করলে আমাকে বললেন, 'আমি বাইরের তৈরি জিনিস' খাই না। মন খারাপ হচ্ছে টের পেয়ে বললেন, সুহাইল (হুযূরের সুযোগ্য সাহেবযাদা। সে তখন কাকরাইলের ছাত্র) পাউরুটি পছন্দ করে, ওকে দিয়ে আসতে পারো।

৪. একবার ঢাকা ভার্সিটি হলে বয়ানের পর হুযূরকে মিষ্টি পরিবেশন করলে বললেন, 'আমি বেনামাজীর হাতে তৈরি খাবার খাই না।'

৫. একবার বয়ানের অসমাপ্ত অংশ জানতে চাইলে বললেন, আমাদের কাজ হলো তলব পয়দা করা; বিস্তারিত জানতে হলে মুফতী সাহেবের কাছে যাও; লালবাগ যাও। পরে লালবাগ মাদরাসার দারুল ইফতায় গিয়ে জেনে নিয়েছিলাম।

৬. একবার বয়ানে ইখলাসের দু'আ বলেছিলেন। বয়ান শেষে ফের বলার জন্য অনুরোধ করলে (এর জন্য লালবাগ যেতে না বলে) হুযূর নিজ হাতে দু'আটি লিখে দেন, যা হাজারো মানুষকে শেখানোর সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ কবুল করুন। আ-মী-ন।

৭. হুযূর ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক, সচেতন ও পরহেযগার। কমবয়স্ক সুশ্রী ছেলেদেরকে বিলকুল প্রশ্রয় দিতেন না এবং তাদের থেকে কোন রকমের খেদমত নিতেন না।

৮. হুযূর ছিলেন হেকমত ও প্রজ্ঞার পাহাড়। একবার ট্রেনে এক যুবক হুযূরকে বেকায়দায় ফেলার জন্য জিজ্ঞেস করল– হুযূর! যে দেশে ৬মাস রাত ও ৬মাস দিন সে দেশে দৈনিক কয় ওয়াক্ত নামায পড়তে হয়? হুযূর বললেন, সে দেশে যাচ্ছেন নাকি? কবে ফ্লাইট? যুবকটি বলল, না হুযূর! ইলম শিক্ষা করা তো ফরয, তাই জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি। হুযূর বললেন, এই এক মাসআলা ছাড়া বাকী সব দীনী ইলম কি অর্জন হয়ে গেছে? বলল, না হুযূর। হুযূর বললেন, বাকী সব ইলম জানা হয়ে গেলে দেখা করবেন। হুযূরের একথায় যুবকটি লা-জবাব হয়ে গেল ।

৯. একবার একলোককে হুযূর দাওয়াত দিচ্ছিলেন। সে কিছুটা গর্বের সুরে বলে উঠল, এবার আপনাদের টঙ্গী ইজতিমায় গেলাম তো! হুযূর বললেন, বড় উপকার করেছেন ভাই। লোকটি জিজ্ঞেস করল, কী উপকার করেছি? হুযূর বললেন, বহুত বহুত উপকার করেছেন; লোকেরা জিজ্ঞেস করে ইজতিমায় কত লোক হয়েছিল? আপনার উসিলায় সহজেই বলতে পারি দশ লাখ। আপনি না গেলে কি এত সহজে বলতে পারতাম! তখন (আপনাকে বাদ দিয়ে) বলা লাগতো ৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯শত ৯৯। আহা, কত কষ্টই না হতো! লোকটা চুপসে গেল এবং অবশিষ্ট কথা নম্র-ভদ্রভাবে শুনে তাশকীল হয়ে গেলো।

১০. একবার হুযূরের ভাতিজা (পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন) এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আমার সঙ্গে ৩দিন জামাতে সময় লাগায়। সে বলেছিল, চাচার বাসায় গেলে চাচী পর্দার কারণে সামনে আসে না। চাচাও আমাকে খাস কামরায় ঢুকতে মানা করে; বলে, অ্যাই! ভিতরে ঢুকবি না, তোর চাচী আছে। প্রশ্ন করলাম মেহমানদারী করে না? বলল, কেন করবে না! একেবারে উন্নতমানের মেহমানদারী করে, তখন মনেই হয় না এতো বড় হুযূর!

১১. একবার হুযূর আমেরিকার জামাত নিয়ে সফর করেন। জামাতে আমার হলের ইংরেজি বিভাগের একসাথীকে দিয়েছিলাম ইংরেজি তরজমা করতে। তার থেকে শুনেছি, তরজমা ভুল হলে হুযূর ঠিক করে দিতেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, হুযূর ইংরেজিও বুঝতেন অথবা এটা ছিল হুযূরের কারামত।

১২. আমেরিকার জামাতে হুযূর রুচিসম্মত খানা রান্না করে দুপুরের খাবার সকাল ১১টা নাগাদ পরিবেশন করে সাথীদের নিকট প্রশংসিত হন। অর্থাৎ হুযূর জামাতে গিয়ে খেদমতের কাজও করতেন।

১৩. আমেরিকার জামাতে এক আমেরিকান নওমুসলিম ঈমান সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় একটি আবেগঘন কবিতা লিখে। কবিতার মর্ম ছিল, আমি দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করে এমন ঈমান হাসিল করব যে, পাহাড়কে বলব, পাহাড় সরে যাও, অমনিই পাহাড় সরে যাবে। কবিতা শুনে হুযূর তাকে বলেছিলেন, এই ঈমান দিয়ে কাজ হবে না; আরও মজবুত ঈমান লাগবে। সে জিজ্ঞেস করল, এর চেয়েও মজবুত ঈমান কী? হুযূর বললেন, পুলসিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার সময় মুমিনের ঈমানের নূরে নিচের সাত জাহান্নামের 'নার' (আগুন) নিভে যাওয়ার উপক্রম হবে ও জাহান্নাম ফরিয়াদ করবে, হে অমুক! তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও, তোমার ঈমানের নূর দ্বারা আমার 'নার' নিভে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। হুযূরের একথা শুনে আমেরিকান খুবই প্রভাবিত হয় এবং মেহনত ও দু'আর মাধ্যমে এই স্তরের ঈমান হাসিল করার নিয়ত করে।

১৪. হুযূর বলেন, তাবলীগে লাগার পর কোন দিন জুমারাতে (বৃহঃস্পতিবার) মারকাযের শবগুজারী বাদ পড়েনি; এমনকি বাসর রাতেও না। হুযূরের বাসর রাত ছিল জুমারাত। হুযূর বাসা থেকে বিছানা নিয়ে মারকাজের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শ্বশুর বললেন, বাবা! আজকে না গেলে হয় না? হুযূর শ্বশুরকে জোর গলায় বললেন, আজকে তো জুমারাত!!

(আলহামদুলিল্লাহ! ১৯৮০/৮১ সালে হুযূরের যবানে এ ঘটনা শুনার পর থেকে অধমেরও (বয়ান লেখকের) শবগুজারীর পাবন্দী হয় এবং মজার কথা হলো ঘটনাক্রমে আমি ও আমার কয়েক সাথীর বাসর রাত জুমারাতে পড়ে যায়; কিন্তু আমাদের শবগুযারী কাযা হয়নি। আল্লাহ কবুল করুন এবং হুযূরকেও এর সওয়াবে ভাগীদার করুন। আ-মী-ন।)

১৫. হুযূর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! তাবলীগে লাগার পর জামাতে বের হয়েছি কিন্তু নগদ জামাত বের হয়নি এমনটি কোন দিনই হয়নি। হুযূর একবার বিদেশী জামাতে চলছিলেন। যিম্মাদার ও সাথীদের মধ্যে নগদ জামাত বের করার ফিকির ছিল না। হুযূর যিম্মাদারকে বললেন, নগদ জামাত বের হওয়া দরকার! যিম্মাদার এ কথায় নারায হয়ে বললেন, আল্লাহ নগদ জামাত না দিলে আমি কী করব? হুযূর বললেন, গাশত করা দরকার। যিম্মাদার আরও নারায হয়ে হুযূরকে গাশতে যেতে বললেন। হুযূর বললেন, একা যাবো? বললেন, একাই যাও। হুযূর সকালে বের হয়ে সন্ধ্যায় ৪/৫ জনকে সাথে নিয়ে ফিরলেন। এদিকে যিম্মাদার সাহেব হুযূরকে সারাদিন না পেয়ে তো খুব ক্ষ্যাপা! অতঃপর হুযূর যখন ৪/৫ সাথীকে পেশ করে বললেন, ইনারা পাসপোর্টসহ এসেছেন, যে কোন দেশে নগদ ৪ মাস সময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন। যিম্মাদার সাহেব বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলেন, কীভাবে হলো? হুযূর যিম্মাদার সাহেবের সকালের সুরে সুর মিলিয়ে জবাব দিলেন, আল্লায় দিলে আমি কী করব? যিম্মাদার সাহেব লজ্জিত হলেন এবং সবক হাসিল করলেন।

১৬. একবার মাসতুরাতের মেহনতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হুযূর বলেন– 'রাজা রাজ্য চালায়, আর রাজাকে চালায় রাণী।'

১৭. বাবা-মায়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হুযূর বলেন– বাবাকে দেখে আল্লাহ চেনা যায়। কারণ আল্লাহকে দেখিনি, নবীর কথা বিশ্বাস করে আল্লাহকে আল্লাহ মানি। তেমনি আমাদের জন্মদাতা বাবা কে সেটা দেখিনি, মায়ের কথা বিশ্বাস করে বাবাকে বাবা মানি। না মানলে সম্মানের সাথে সমাজে থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে। অনুরূপ মা'কে দেখে নবীকে চেনা যায়। মায়ের সাথে সন্তানের নাড়ীর টান আছে। একইভাবে নবীর সাথেও উম্মতের (সাহাবাদের) সোহবতের সম্পর্ক আছে।

১৮. একবার কাকরাইলে হায়াতুস সাহাবা কিতাবের তালীমের পর রাতের বেলা তৃতীয় তলার ছাদে আমাদের (ভার্সিটির ছাত্রদের) মজমায় মায়ের হক আদায়ের ব্যাপারে হুযূর বলেন, তোমরা সারা দুনিয়ার লোকের সূরা-ক্বিরাত সংশোধন করো, জামাতে গিয়ে সাথীদের সূরা ক্বেরাতের মশক করাও, এবার আমাকে বলো, তোমরা কে কে নিজের মায়ের সূরা-ক্বেরাত শুনেছো এবং সংশোধন করে দিয়েছো?!

হুযূর বলেন, পিতাকে আল্লাহর রাস্তায় বের করতে হলে পিতার সঙ্গে উত্তম আখলাক দেখাতে হবে। এ প্রসঙ্গে হুযূর এক পীর সাহেবের ঘটনা বললেন যে, মুরীদ চিল্লায় গেছে এজন্য পীর সাহেব মুরীদের উপর ভীষণ ক্ষ্যাপা। মুরীদ চিল্লা থেকে ফেরার পর পীর সাহেব তাকে ইচ্ছামতো বকাঝকা করলেন। এতো এতো বকাঝকার পরও মুরীদ একদম চুপচাপ। এবার পীর সাহেব অন্যান্য মুরীদদের বললেন, এতো

বকাঝকা করলাম একটা শব্দও করল না! কি চমৎকার আখলাক শিখে এসেছে! এই আখলাক শেখার জন্য তোমরাও সবাই চিল্লায় যেতে পারো!! সুবহানাল্লাহ!

১৯. পূর্ণাঙ্গ জিনিসের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হুযূর বলেন, একলোক আর্মিতে চান্স পায় নাই। কারণ তার এক চোখ কানা। চান্স না পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তাকে বলা হলো যে, তার এক চোখে সমস্যা। এখন এই লোক যদি যুক্তি দেখায় যে, বন্দুক ধরে গুলি করতে তো এক চোখ বন্ধই করতে হয়, আর আমার তো এমনিতেই বন্ধ আছে, অসুবিধা কোথায়? বলুন, তার কথা যুক্তিসম্মত হলেও কি সে চান্স পাবে? পাবে না। তেমনই যিকির/তাসবীহ আল্লাহর ধ্যানের সঙ্গে করতে হবে, নয়তো তা বিকলাঙ্গ গণ্য হবে।

২০. হুযূর বলেন, আজ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যত সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সব নামাযের বদদু'আর কারণে। হাদীসে এসেছে, নামায খুশুখুযুর সাথে না হলে তা নামাযীর জন্য বদদু'আ করতে থাকে যে, তুমি আমাকে যেমন ধ্বংস করেছো আল্লাহও তোমাকে তেমন বরবাদ করুক। আজ আমরা নামাযের বদ দু'আর শিকার। তাই নামাযের ভিতর-বাহির সুন্দর করে নামাযের দু'আ অর্জন করতে হবে।

২১. হুযূর বলেন, তাবলীগওয়ালারা মাশোয়ারায় উল্টাপাল্টা করলে এর প্রভাব দেশের পার্লামেন্টে গিয়ে পড়ে। দেশের পার্লামেন্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সারা দেশে এর প্রভাব পড়ে।

২২. জনৈক ব্যক্তি হুযূরের ব্যাপারে অতিরঞ্জন বা মজাক করে কাউকে বলেছিল, হুযূর তো মেরাজে গেছেন! শুনে হুযূর অত্যন্ত না-খোশ হন এবং এই অতিরঞ্জন ও বেহুদা মন্তব্য সম্পর্কে বলেন, আশ্চর্য! এরা তো আমাকে মেরাজে পাঠিয়ে ছাড়ল!

২৩. হাদীসে কুদসীর আলোকে হুযূর বলতেন– চার ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে যায়। যে আল্লাহর জন্য–

(ক) কাউকে ভালোবাসে। (খ) কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। (গ) কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বসে। (ঘ) কারও উপর সম্পদ ব্যয় করে।

২৪. দীনী দাওয়াতের তাকাযা পূরণের ব্যস্ততার কারণে আল্লাহ তা'আলা দা'য়ীর সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। কুরআনে কারীমে এর ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম হুদহুদ পাখির গরহাজিরীর জন্য কঠিন শাস্তি দেয়ার (জবাই করে ফেলার) সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন। কারণ, হুদহুদ বহুদূর সফর করে সূর্যপূজারী বিলকিসকে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানোর তাকাযা নিয়ে এসেছিল।

২৫. হুযূর বলেন, তাবলীগে লাগার পরের সন্তান আর আগের সন্তানের মধ্যে পার্থক্য হয়। কথার কথা, পিতা-মাতার কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মা যখন কাঁদতে থাকে, তাবলীগে লাগার আগের সন্তান জানতে চায় কী হয়েছে? মা বলে, তোর আব্বায় মারছে। ছেলে বলে, বটিটা কই? মা বলে, ক্যান্? বলে, আব্বারে জবাই করে ফেলব। পক্ষান্তরে তাবলীগে লাগার পরের সন্তান বলে, মা! সবর কর, আল্লাহ আজর ও সওয়াব দিবেন। কারণ হলো, তাবলীগে লাগার আগের সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় মা-বাবা তখন শরীয়ত-সুন্নত বুঝতো না, মানতো না। আর পরের সন্তানের যখন জন্ম হয়, তাবলীগে লাগার কারণে দিলে দীনের তলব পয়দা হওয়ায় পিতা-মাতা শরীয়ত ও সুন্নতের অধীন হয়ে জীবন যাপন ও সংসার পরিচালনা করতো।

২৬. তালেবে ইলমের জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষণতা বুঝাতে গিয়ে বলেন, একবার জনৈক বাদশাহ উজিরকে সঙ্গে করে বিকালবেলা মাদরাসার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। উজির ছিল আলেমবিদ্বেষী। সে মাদরাসার দিকে ইশারা করে বাদশাহকে বলল, এটা আহাম্মক তৈরির কারখানা! বাদশাহর অন্তরে ইলমে দীন ও আলেম-উলামার প্রতি আযমত-সম্মান বিদ্যমান ছিল। বাদশাহ উজিরকে প্রশ্ন করলেন, মাদরাসার সামনের পুকুরটায় কয় চামচ পানি হতে পারে? এমন অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে উজির তো লা-জবাব। এবার বাদশাহ মাদরাসার মাঠে খিলাধূলা রত এক ছাত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো এই পুকুরটায় কত চামচ পানি আছে? ছাত্রটি উল্টো বাদশাহকে প্রশ্ন করল, আপনার চামচটা কত বড়? চামচ যদি পুকুরটার সমান হয় পানি হবে ১ চামচ, অর্ধেক হলে ২ চামচ, তিনভাগের একভাগ হলে ৩ চামচ আর চামচটি পুকুরের চারভাগের একভাগ হলে পানি হবে ৪ চামচ....। বাদশাহ ছাত্রটিকে বাহ্বা দিয়ে বিদায় দিলেন এবং উজিরকে বললেন, এবার বলো আহাম্মক কে? এই ছাত্র নাকি তুমি? তারপর উজিরকে উপস্থিত বরখাস্ত করে দিলেন।

২৭. হুযূর বলতেন, খেদমতের উদ্দেশ্য হলো তাওয়াজু ও নম্রতা পয়দা করা, নফস ও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা। বড় বড় মুরুব্বীর খেদমত করার মধ্যেও খাহেশাত (প্রবৃত্তির তাড়না) লুকিয়ে থাকে। যেন পরে বলতে পারে, আমি অমুকের খাদেম ছিলাম। নির্বাচনী প্রচারণায় 'অমুককে ভোট দিন-জনসেবার সুযোগ দিন' সম্পর্কে হুযূর বলতেন, এই জনসেবা-কামীদের শহরের অলি-গলিগুলো নিজ হাতে পরিষ্কার করতে বলো। এই জনসেবায় ভোটেরও দরকার হবে না, কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করবে না। আসলে খেদমত করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে সুযোগের অভাব নেই।

২৮. হুযূর বলতেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তার সফরে আপনা জান, আপনা মাল লাগাও, নয়তো তাবলীগের ফায়দা পাওয়া যাবে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াত 'বি-আমওয়ালিকুম ওয়া-আনফুসিকুম' তিলাওয়াত করতেন। আবার সীরাতুন্নবী থেকেও উদাহরণ পেশ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত হযরত আবূ বকর রাযি.-এর মালকে নিজের মাল মনে করে খরচ করতেন; কিন্তু হিজরতের সময় উট করয নিয়ে সফর করেন।

২৯. নিজের মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সহজ পন্থা হিসেবে হুযূর ব্যয়-সংকোচন-নীতি অবলম্বন করে আমাদেরকে কিছু কিছু পয়সা জমাতে বলতেন। সেমতে আমি ছাত্রজীবনে ১টা পরাটা কম খেয়ে বা ভাজি ছাড়া শুধু পরাটা খেয়ে ৫০ পয়সা করে বাঁচিয়ে রাখতাম। এভাবে একসময় ৫০০/- টাকা জমা হয়েছিল। অনার্স ২য় বর্ষে পড়াকালীন ১৯৮০ সনে ৫০০-/ টাকা করয করে মোট ১০০০/- টাকায় (সে সময়ের ৫০ ডলার) প্রথম নিজামুদ্দীন সফর করি। অতঃপর চিল্লা হতে ফিরে ঢাকা কলেজের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বোর্ড হতে ইন্টার-এর রেজাল্টের উপর প্রাপ্ত স্কলারশীপের টাকা দিয়ে উক্ত করয পরিশোধ করি।

৩০. ১৯৮০/১৯৮১ সালে একবার কাকরাইলে বাদফজর বয়ানের পর হুযূর 'সিদ্দীকী' তারতীবে পুরো যিন্দেগীর তাশকীল করেন। আল্লাহর উপর হিম্মত করে পুরো মজমা থেকে আমি একাই দাঁড়িয়ে যাই। হুযূর খুব খুশি হন এবং আমাকে নিয়ে আলাদা করে বসে দীর্ঘক্ষণ হাল-পুরসি করেন। অতঃপর বলেন, প্রথমে পড়াশোনা শেষ করে ৩চিল্লা লাগাও। তারপর কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে যখন কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করবে

তখন কাকরাইলের মাশওয়ারায় এসে নিজেকে পেশ কোরো। সে মতে ০১ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে দীর্ঘ সাড়ে ৩৪ বছরের সরকারী চাকুরী [অধ্যাপক, ইংরেজী] হতে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে ০৩ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে কাকরাইলে গিয়ে নিজেকে পেশ করি। মাওলানা রবিউল হক ছাহেব দা.বা. ১৫ জানুয়ারী ২০২১ তারিখ জুমাবার সকালে তাজবীযের খাতায় নাম লিখিয়ে ০৯.৩০-এ মাশোয়ারায় পেশ হতে বলেন। যথাসময়ে মাশওয়ারায় উপস্থিত হই। অতঃপর মাওলানা যুবায়ের ছাহেব দা.বা.-সহ আহলে শুরা ও অন্যান্য যিম্মাদার সাথীদের রায়ের ভিত্তিতে কাকরাইল মারকাযে আধা-যিন্দেগীর জন্য (৪০দিন কাকরাইলের তাকাযায়, ৪০ দিন ব্যক্তিগত তাকাযায় এই তারতীবে) আমাকে কবুল করা হয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান ছাহেব রহ.-এর কবরখানাকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দিন। আল্লাহ তা'আলার খাছ মেহেরবানীতে এবং হুযূরের তাশকীলের উসীলায় ১৯ জানুয়ারী ২০২১ মঙ্গলবার হতে আমি অধম আহলে কাকরাইলের একজন! ফালিল্লাহিল হামদ্ ওয়াশ শুক্র। **(চলমান)**

[বি. দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালা অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী– জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেঝো সাহেবযাদা)]

জরুরী সংশোধনী: দ্বিমাসিক রাবেতার গত (যিলহজ্জ ১৪৪৩ হি.) সংখ্যায় *হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান রহ.-এর সোহবত হতে প্রাপ্ত অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার* লেখাটির প্রথম পৃষ্ঠার (পত্রিকার ২৯ নং পৃষ্ঠা) ২য় কলামে ১৭ নং লাইন থেকে ২৭ নং লাইন পর্যন্ত কয়েকটি ইংরেজী শব্দ ও বর্ণ বাংলা ফন্টে ছাপা হয়েছে। **এর প্রকৃত অবস্থা এই–**

"*আল্লাহ শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। 'আল্লাহ'কে God বলা যাবে না। আল্লাহ ও God এক (সমার্থ) নয়। কারণ, God এর স্ত্রীলিঙ্গ আছে এবং বহুবচনও আছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ এগুলো হতে পুরোপুরি পবিত্র; আল্লাহ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না, আল্লাহ শব্দের বহুবচনও হয় না। God এর প্রথম অক্ষর G বাদ দিলে হয়ে যায় Od (অর্থহীন)। God এর শেষ অক্ষর বাদ দিলে হয় Go (অর্থ: যাও, ভাগো)।*"

পাঠককে নিজ নিজ কপি সংশোধন করে নেয়ার অনুরোধ জানানো হলো।

(২১ পৃষ্ঠার পর : নারী প্রসঙ্গে আমার কথা)

হিংস্র ভ্রাতৃত্বের জায়গা দখল করবে। আমাদের দেশ মুক্তি পাবে সকল সীমাবদ্ধতা থেকে, আমাদের অর্থনীতি পরনির্ভরশীলতা থেকে, আমাদের ভ্রমণ প্রতিবন্ধকতা থেকে, আমাদের দীক্ষাদান পশুসুলভ নির্মমতা থেকে, আমাদের ব্যবসা শুল্ক থেকে, আমাদের যুবসমাজ সেনানিবাস থেকে, আমাদের বীরত্ব লড়াই থেকে, আমাদের বিচার ব্যবস্থা ফাঁসির মঞ্চ থেকে, আমাদের জীবন তরবারী থেকে, আমাদের বাকশক্তি বন্ধন থেকে, আমাদের হৃদয় জোরপ্রয়োগ থেকে, বাস্তবতা অবাস্তব থেকে, উপাস্য সন্ন্যাসী থেকে, আকাশ জাহান্নাম থেকে এবং ভালোবাসা রোষ ও স্বার্থ থেকে।' ভালোবাসা রোষ ও স্বার্থ থেকে মুক্তি পাওয়া দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, আত্মসম্মানের সীমাবদ্ধতার স্থানে খোলামনের প্রশস্ততা জায়গা করে নেবে।

তথাপি পাশ্চাত্যের সুস্থরুচির লোকজন এই অবাধ মেলমেশাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার তিক্ততা অনুভব করছে। তারা আক্ষেপভরা অভিব্যক্তিতে সত্য কথাগুলো উচ্চারণ করছে। তুরস্কের বড় লেখক মরহুম জনাব শিহাবুদ্দীন বেগ তার বই 'আওরাকুল আইয়াম' (কালের শ্বেতপত্র)-এ ফ্রান্সের শীর্ষ কবিদের একজন মাদাম দোলারু মারদিরুস'র বক্তব্য উদ্ধৃত করেন– 'তোমাদের নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের সৌভাগ্যের কদর করে, পর্দাবৃত যে জীবন তাদের যাপন করতে হয় তার যেন মূল্যায়ন করে। এই পর্দাব্যবস্থা তাদেরকে বহু সমস্যা থেকে সুরক্ষা দেয়। তারা যদি আমার ঐ সকল বান্ধবীদের সংখ্যা জানতো যারা আমার কাঁধে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছে! হ্যাঁ, আমার কানে গচ্ছিত আছে বহু নারীর হৃদয়বিদারক দুঃখগাথা! হ্যাঁ, জৌলুসময় নৃত্যসভায় নারী-পুরুষের প্রবেশ স্পষ্টভাবেই পরস্পরকে আহ্বান। এই আহ্বান সেই স্ত্রীর হৃদয়কে দংশন করতে থাকে যে কিনা তার প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে এই নৃত্যসভাগুলোতে প্রবেশ করে। তার কাছে এই নৃত্যসভাগুলো যেন ডোরাকাটা সাপ। কেমন ভয়ঙ্কর সেই সাপ তোমাদের কি জানা আছে?! এই সব নৃত্য-জলসা, নাট্যমঞ্চ আর ক্লাবগুলো শুধু আযাবের ঘর। যেখানে মানুষ যায় একটা সেন্ট কিংবা তুচ্ছ কিছু পাওয়ার আশায়। আপন স্ত্রীর প্রতি সিরিয়াস একজন স্বামী কিংবা স্বামীকে ভালোবাসে এমন স্ত্রীর জন্য এই জলসাগুলো জাহান্নাম! তোমরা কি তা বুঝতে পারো?! যদি বুঝে থাকো, তবে নিজেদের স্ত্রী ও ভাইদেরকে কথাগুলো পৌঁছে দাও।'

পর্দাহীনতার প্রবক্তারা পরনারীদের সঙ্গে মেলামেশা ও উপভোগের খাতিরে তাদের হৃদয়জাত আত্মমর্যাদার আহ্বানকে জোর করেই থামিয়ে ও দমিয়ে দিতে চায়। এর প্রমাণ হলো, তাদের মুসলিম নামধারী অনুসারীরা তাদের নিজেদের নারীদের কাছে আসার অনুমতি শুধু তাদেরকেই দেয়, যারা তাদের নারীদের ক্ষেত্রেও এদেরকে কাছে আসার অনুমতি দেয়। যদি তাদের পর্দামুক্তির শ্লোগানের উদ্দেশ্য এই হতো যে, তারা নারীদেরকে পর্দার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করতে চায় যেমনটি তাদের দাবী, তাহলে তারা নিজ নারীদেরকে যে কোনো পরিচিতজনের কাছে উন্মোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই অদল-বদলের শর্ত লক্ষ্য রাখতো না।

বর্তমান যুগের নারীদের পর্দামুক্তির উদ্দেশ্য কল্যাণজনক কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয় এবং এই দাবী কোনো সরল মতলবেও তোলা হচ্ছে না, আর এ দিয়ে সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষ স্বাধীন (দাসদাসী নয়–অনুবাদক)-এর চেয়ে বাড়তি কোনো সমতাও অর্জিত হচ্ছে না। এর পক্ষে সুস্পষ্ট একটি প্রমাণ হলো, পুরুষ নিজেদের শরীরের যতোটুকু উন্মোচিত রাখে নারীদের উন্মোচন অতোটুকুতে আটকে থাকে না। ফলে তারা হাতের গোছা থেকে শুরু করে কাঁধ পর্যন্ত খুলে ফেলে। বুক, পিঠ আর পায়ের গোছাও উন্মুক্ত করে দেয়। অথচ পুরুষরা নিজেদের এ সকল অঙ্গ খুলতেই হবে এমনটি মনে করে না। ফলাফল হলো 'পর্দাহীনতা' তার আভিধানিক অর্থের সীমানা পার করে ফেলেছে। আভিধানিক অর্থ ছিল শুধু চেহারা খোলা। এখন তার অর্থ গিয়ে দাঁড়িয়েছে অর্ধোলঙ্গ হওয়া বা শরীরের দুই-তৃতীয়াংশ খুলে ফেলা এবং এই অবস্থায় পর-পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা। যে দেশের মানুষ নিজেদের নারীদের পূতঃপবিত্রতা রক্ষায় যত্নশীল সে দেশে এমন বেপর্দেগীর অনুমোদন আমরা দিতে পারি না। আমরা মনে করি, এই বেপর্দেগী পাপাচার ও গোলযোগের দিকে নিয়ে যায়। যে সকল লেখক পর্দাহীনতার শ্লোগানকে নিজেদের মৌলিক বিষয় বানিয়ে নিয়েছেন তাদের দেখে আমরা তাজ্জব বনে যাই, যখন তারা মাঝে-মধ্যে নারীদের বিভিন্ন রিসোর্টে কিংবা সাগরসৈকতে অপদস্থতা বা নিগ্রহের শিকার হওয়া নিয়ে অভিযোগ করেন এবং তরুণ-তরুণীদের তীব্র যৌন তাড়নার পেছনে ছুটে চলা নিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করেন!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ভাষান্তর: মাওলানা সাঈদুর রহমান মুমিনপুরী
মুদাররিস: মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বছিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

মডারেট ইসলাম : ঈমান বিধ্বংসী এক বিষাক্ত অস্ত্র

মাওলানা হাফিজুর রহমান মাদারীপুরী

সূচনা কথন:

মানুষ কেমন চরিত্রের তা আল্লাহর চেয়ে ভালো কেউ জানে না। যিনি যে জিনিস তৈরি করেন তিনিই তার সম্পর্কে ভালো জানেন। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে– صاحب البيت ادرى بما فيه (ঘরের মালিক ঘরের ভিতরকার বিষয়-আশয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।) আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো জানার কেউ নেই। ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাদের চরিত্র-মানসিকতা সম্বন্ধে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন এটিই চির বাস্তবতা। তিনি তাদের সম্বন্ধে যা বলবেন তা-ই অমোঘ সত্য। এতে চুল পরিমাণ ব্যত্যয় হওয়ার সুযোগ নেই, সন্দেহেরও বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মানসিকতা সম্বন্ধে একটি চরম সত্য তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ:) ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। (সূরা বাকারা-১২০) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ:) হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। (সূরা মায়িদা-৫১) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নমনীয় মানুষ। দয়ার আধার প্রিয় এ মানুষটি ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের ব্যাপারে ছিলেন চরম কঠোর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ:) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ-২৯) স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (অর্থ:) আমি অবশ্য অবশ্যই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবো। এমনকি এখানে মুসলিম ব্যতীত কাউকে রাখবো না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৭৬৭)

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে এতোটা কঠোর কেন? উত্তর হলো, আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম ওদের চোখের কাঁটা। ওরা ইসলাম ও ইসলামের প্রকৃত ধারকদেরকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। ইসলাম ও প্রকৃত মুসলিমের বিনাশসাধন ওদের আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন। ওরা যে ধর্মের কথা বলে ওগুলো তো ধর্ম নয়; বরং কুফর শিরক। আর কুফর শিরক কোনো দীন বা ধর্ম নয়; বরং ওগুলো ধর্মের নামে প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসমাত্র। তাই ওরা প্রকৃত দীন ইসলামকে নিজেদের প্রবৃত্তিপ্রসূত জীবনব্যবস্থার জন্য অন্তরায় মনে করে। এ কারণে সর্বক্ষণ ওরা ইসলাম-বিরোধিতায় কর্মতৎপরতা দেখায়। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের যে মনমানসিকতা পবিত্র কুরআনে চিত্রিত করেছেন তার চরম বাস্তবতা আমরা ইতিহাসের বাঁকেবাঁকে বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাই। বর্তমানেও তাদের সেই মানসিকতার বাস্তবায়ন থেমে নেই। নানা কৌশল ও নানা উপায়ে তারা ইসলাম-বৈরিতার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মডারেট ইসলাম যুগে যুগে চলে আসা তাদের ইসলাম-বৈরিতারই এক অভিনব সংস্করণ।

মডারেট শব্দের আভিধানিক পরিচিতি

Moderate শব্দটির আভিধানিক অর্থ মধ্যপন্থী। সে হিসেবে মডারেট ইসলাম অর্থ দাঁড়ায় মধ্যপন্থী ইসলাম। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটিতে তেমন সমস্যা চোখে পড়ে না। কারণ ইসলাম মূলগত দিক থেকে প্রান্তিকতামুক্ত মধ্যপন্থী একটি কালজয়ী আদর্শ। এখানে বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। পবিত্র কুরআনেও এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ:) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। (সূরা বাকারা-১৪২) কিন্তু পারিভাষিক দৃষ্টিতে শব্দটির মাঝে রয়েছে মরণঘাতি বিষের বিষাক্ত মিশেল।

পরিভাষায় মডারেট ইসলাম

আভিধানিক অর্থে 'মডারেট ইসলাম' শব্দযুগলের ব্যবহার নেই। এটি এখন স্বতন্ত্র একটি পারিভাষিক রূপায়ণ। পশ্চিমাবিশ্ব বিশেষ একটি অর্থে এ পরিভাষাটির উদ্ভাবন করেছে। এর সঙ্গে পশ্চিমাদের চেতনা ও মূল্যবোধের নিবিড় সম্পর্ক জড়িত। অল্প কথায় পাশ্চাত্য-বিশ্বাস ও ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাটছাঁট করা বিকৃত ইসলামই হলো মডারেট ইসলাম। আর পাশ্চাত্য-উদরে জন্ম নেয়া এ বিকলাঙ্গ ইসলামকে ধারণকারী ব্যক্তিবর্গই হলো মডারেট মুসলিম। অনেকটা সংকর প্রজাতির প্রাণীর মতো।

নেদারল্যান্ডসের রাজধানী দ্য হেগে অবস্থিত International Centre for Counter-Terrorism - ICCT এর গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত 'Moderate Muslims and Islamist Terrorism: Between Denial and Resistance' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মডারেট মুসলিমের সংজ্ঞায়নে বলা হয়েছে, যাদের মডারেট মুসলিম বলা হয় তাদেরকে আমরা কেন মডারেট বলবো? এজন্য যে, তারা শান্তিপ্রিয়, সন্ত্রাসবিরোধী এবং পশ্চিমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এরপর বিষয়টিকে আরেকটু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, 'মডারেট মুসলিম হলো, যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর মৌলবাদী মুসলিম হলো, ইসলামী শরীয়ার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর মধ্যে পার্থক্যের মূল ভিত্তি হলো ইসলামী শরীয়ার আইনী ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা এবং না করা।' বস্তুত মুসলিম হয়েও যারা মানব জীবনে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীকে অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে তারাই মূলত পশ্চিমাবান্ধব মডারেট মুসলিম।

মডারেট ইসলাম পরিভাষাটির জন্মের প্রেক্ষাপট

১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া বিশ্বযুদ্ধোত্তর মুসলিম রাষ্ট্রগুলো খ্রিস্টচক্রের উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিমাবিশ্ব নানা কৌশলে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। আবার কোথাও তাদের প্রশ্রয়ে জেঁকে বসে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন। পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া এ দুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আশির দশকে মুসলিমদের মাঝে জাগরণ তৈরি হয়। এ জাগরণ পশ্চিমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠে। তাই পশ্চিমারা তাদের অনুগামী

পশ্চিমাবান্ধব একটি মুসলিম শ্রেণী তৈরির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকাকে একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে জেনারেল হেনরি হাপ অর্নাল্ডের নেতৃত্বে একটি সংস্থা তৈরি হয়। সংস্থাটির নাম RAND Corporation। এর পূর্ণরূপ হলো Research and Development Corporation। অর্থাৎ গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো, আমেরিকার অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণী বিষয়ে গবেষণা করা। আমেরিকার স্বার্থবিরোধী পক্ষকে পারস্পরিক জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং তাদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করে দুর্বল করার পেছনে র‍্যান্ড কর্পোরেশন প্রচুর গবেষণা করে থাকে। প্রধানত র‍্যান্ডের গবেষণাগুলো ব্যয়িত হয় ইসলাম ও মুসলিমদের পেছনে। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ভিত্তিতেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মুসলিমরা যাতে কখনো পরাশক্তি হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন বিপুল পরিমাণ গবেষণা করে থাকে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণালব্ধ অনুসন্ধানী রিপোর্ট মার্কিন গভর্নমেন্টে জমা দিয়েছে র‍্যান্ড কর্পোরেশন। কীভাবে আমেরিকার বৈশ্বিক পলিসির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নতুন ইসলামের প্রবর্তন করা যায় তা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে র‍্যান্ড কর্পোরেশন। প্রতিবেদনটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম হলো, Civil Democratic Islam: Partners, Resources & Strategies। অর্থাৎ নাগরিক গণতান্ত্রিক ইসলাম: অংশীদার, সম্পদ এবং কৌশল। الاسلام الذي يريده الغرب : دراسة تحليلية نقدية لتقرير مؤسسة راند : حضاري ديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات শিরোনামে র‍্যান্ডের উল্লিখিত রিপোর্টটির উপর করা প্রলম্বিত একটি আরবী পর্যালোচনা সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পর্যালোচনাটি মূলত সৌদী আরবের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ-দাওয়া অনুষদ থেকে মাস্টার ডিগ্রির থিসিসরূপে তৈরি হয়েছে।

মুসলিমদেরকে মডারেট বানানোর লক্ষ্যে র‍্যান্ডের স্বতন্ত্র গবেষণা ও তৎপরতা রয়েছে। ২০০৭ সালে প্রকাশিত Building Moderate Muslim Networks শিরোনামের প্রতিবেদনটিতে মুসলিমদেরকে মডারেট বানানোর ভয়াবহ এজেন্ডা ও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। استراتيجيات غربية لاحتواء الاسلا : قراءة فى تقرير راند ٢٠٠٧ শিরোনামে উক্ত প্রতিবেদনটির একটি আরবী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানো র‍্যান্ডের আলোচ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োগিক নীতি ও কলাকৌশলগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত Promoting Online Voices for Countering Violent Extremism শিরোনামের রিপোর্টটিতে মডারেট ইসলামের প্রচার প্রসার ও কট্টরপন্থা ও চরমপন্থা তথা ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধ ও চেতনাকে মোকাবেলা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসব রিপোর্টের সারবক্তব্য হলো, ইসলামের মূল ও পুরনো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন আঙ্গিকে পশ্চিমা ইসলাম বা অ্যামেরিকান ইসলাম প্রবর্তন করে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া।

মডারেট ইসলামের লক্ষ্য

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনের চতুর্মাসিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে আমেরিকা এমন একটি যুদ্ধে লিপ্ত যা একই সঙ্গে সামরিক ও আদর্শিক। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা তখনই সম্ভব যখন চরমপন্থীদেরকে (প্রকৃত মুসলিমদেরকে) তাদের স্বজাতি, পরোক্ষ সমর্থক এবং নিজেদের দেশের জনগণের চোখে কলঙ্কিত করে তোলা যাবে।

u.s. news and world report নামের একটি নিউজ সাইটে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণার জন্য যার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম সমাজকেই প্রভাবিত করা নয়; বরং স্বয়ং ইসলামকেই বিকৃত করে ফেলা। ওয়াশিংটন মডারেট ইসলাম তৈরির লক্ষ্যে গোপনে অন্তত দুই ডজন দেশে অর্থসাহায্য দিয়ে আসছে। মডারেট ইসলামকে জনপ্রিয় করার জন্য রেডিও-টেলিভিশনে ইসলামী (?) অনুষ্ঠান প্রচার করা, মুসলিম স্কুলে বিভিন্ন কোর্স চালু করা, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বাগে আনা, মসজিদ নির্মাণ করা, কুরআন শরীফ ছাপানো, ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দেশে দেশে প্রচুর পরিমাণ অর্থায়ন করে যাচ্ছে।

র‍্যান্ডের দৃষ্টিতে মুসলিমদের প্রকারভেদ

র‍্যান্ড কর্পোরেশন Civil Democratic Islam: Partners, Resources & Strategies শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিশ্বের মুসলিমদেরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে।

(১) Fundamentalist Muslim। অর্থাৎ মৌলবাদী ও চরমপন্থী মুসলিম। যারা ইসলামকে নিছক কিছু আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত আচার-ইবাদতের ধর্ম বলে মনে করে না; বরং ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বাস করে, যারা চায় কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করতে, যারা চায় ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়সহ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চায় তারাই হলো র‍্যান্ডের দৃষ্টিতে চরমপন্থী ও মৌলবাদী। সারকথা, র‍্যান্ডের দৃষ্টিতে আধুনিক গণতন্ত্র, লিবারেল-সেক্যুলার মূল্যবোধ এবং পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারের প্রতি বৈরিতা পোষণকারীই হলো চরমপন্থী ও উগ্রবাদী। যে কোনো মূল্যে এদের বিনাশ করা আমেরিকার প্রধানতম লক্ষ্য।

(২) Traditionalist Muslim। অর্থাৎ ঐতিহ্যবাদী মুসলিম। যে সকল মুসলিম ইসলামের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে, যারা ইলম চর্চা, ধর্মপ্রচার এবং আত্মশুদ্ধিকেন্দ্রিক কাজগুলোকেই একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে, মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকা নিয়ে পড়ে থাকাকেই যারা একমাত্র নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হিসেবে গ্রহণ করে তারাই হলো ট্রেডিশনালিস্ট বা ঐতিহ্যবাদী মুসলিম। এ শ্রেণীর মুসলিমদেরকে আমেরিকা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে না। তবে এরা মৌলবাদী মুসলিমদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলে আমেরিকার জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে এ শ্রেণীর মুসলিমদেরকে নিজ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখার জন্য আমেরিকার বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে। এ দুটি শ্রেণী যেন কোনোভাবে কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ না পায় সে জন্য আমেরিকা সদা তৎপর থাকে।

(৩) Moderate Muslim। এ শ্রেণীটিকে মডার্নিস্ট মুসলিম, প্রগতিশীল মুসলিম ও লিবারেল মুসলিম বলেও অভিহিত করা হয়। যারা আদি ও মূল ইসলামকে সেকেলে মনে করে, ইসলামকে প্রবৃত্তির

সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পালন করতে চায় এবং পাশ্চাত্যধারার জীবনব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে একাকার করে ইসলামকে পালন করতে চায় তারাই হলো মডারেট মুসলিম।

৪। Secularist Muslim। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম। যারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তিজীবনে পালনীয় মনে করে, রাষ্ট্রকে ইসলাম থেকে আলাদা মনে করে, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদিকে ইসলামের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করে তারাই মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম। এ শ্রেণীর ব্যাপারে আমেরিকার মাথাব্যথা নেই। কারণ এরা তাদের জন্য ঝুঁকির কারণ নয়। তারা আগে থেকেই আমেরিকার করতলগত।

বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা মডারেট ইসলামের অন্যতম একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ। সুতরাং র‍্যান্ডের করা শেষোক্ত সেক্যুলারিস্ট মুসলিম বিভক্তিটি স্বতন্ত্র কোনো বিভক্তি নয়; বরং এটি মডারেট ইসলামেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূলত ইসলাম চরম ও নরম উভয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত আদর্শ। এখানে নমনীয়তা-নম্রতার যেমন স্থান রয়েছে তদ্রূপ স্থান-কাল-পাত্রভেদে চরম ও গরমেরও উপস্থিতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ:) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ-৯) স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, (অর্থ:) আমি অবশ্য অবশ্যই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবো। এমনকি এখানে মুসলিম ব্যতীত কাউকে রাখবো না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৭৬৭) সুতরাং ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষে ইসলামী শরীয়তে চরমপন্থারও সবিশেষ স্থান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, (অর্থ:) হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারা-২০৮) আল্লাহ ও রাসূলের এ সব নির্দেশ পালনার্থে আমি ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করবো। আমি ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবো। এতে আমাকে কে কী বলবে তাতে আমার কিছু যাওয়া-আসার কথা নয়। আল্লাহর বিধান অনুসারে আমাকে কখনো চরমপন্থী হতে হলে চরমপন্থী হবো, আবার কখনো নরমপন্থী হতে হলে নরমপন্থী হবো। সব নমনীয়তা ভালো নয়, তদ্রূপ সব কঠোরতাও নিন্দনীয় নয়। কমিউনিস্টরা অনেক গরম কথা বলে। ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবিপ্লবী হয়। কিন্তু এজন্য তারা উগ্রবাদী, চরমপন্থী আখ্যা পায় না এবং তাদের কথা-কাজে চরমপন্থা পাওয়া যায় না। কারণ তাদের মাঝে ইসলাম নেই। কারণ তাদের গরম কথা ও সশস্ত্র পন্থা গ্রহণের কারণে পশ্চিমা রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে না। তাই পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যাটা মূলত মুসলিমরা নয়; বরং তাদের মূল সমস্যা হলো ইসলাম। এটা পশ্চিমাদের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। তাই যে কোনো মূল্যে ইসলামকে বদলে দিতে হবে। এটাই তাদের মূল টার্গেট। নানা কৌশলে সন্তর্পণে তার বাস্তবায়নই আজ দেশে দেশে চলছে।

আমি দীনের কাজ করবো। কিন্তু কাজটা এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যাতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়িত না হয়। আমার দীনের কাজ ও মেহনতে এবং আমার দীনের উপর চলায় যদি সামগ্রিকভাবে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা তুষ্টি প্রকাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে আমার দীনের কাজের ধরনে এবং আমার দীনকেন্দ্রিক চিন্তা-বিশ্বাসে ত্রুটি রয়েছে। সেটাকে সংশোধন করে নেয়া আমার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে একজন মুসলিম পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে পালন করলে এবং তার কথা ও কাজে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ইসলাম ফুটে উঠলে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা আদৌ তুষ্টি প্রকাশ করবে না। আমাকে নিয়ে কে কী ভাবে, কে কী পরিকল্পনা করে এসব বিষয়-আশয় সম্বন্ধে আমার জানা-শোনা থাকা প্রয়োজন। নতুবা শত্রুর পাতা ফাঁদে আটকে যেতে পারি। বস্তুত ইসলাম প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমাবিশ্ব কিংবা অন্য কারো বিরোধিতা করে না। ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগার কারণে কিংবা সম্পদ লুট ও জমি দখলের জন্য যুদ্ধ করে না। ইসলামে বিরোধিতা ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য একটিই; সেটি হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে পরিপালন করা ও প্রতিষ্ঠিত করা।

মডারেট ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলী

কে মডারেট মুসলিম হতে পারবে? মডারেট মুসলিম হতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? সে সব বৈশিষ্ট্যের প্রলম্বিত একটি তালিকা তাদের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তালিকাটি নিম্নরূপ:

(ক) ইসলামী শরীয়াসম্মত খিলাফতব্যবস্থার বিরোধিতা করা।
(খ) জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নের বিরোধিতা করা।
(গ) ইসলামী শরীয়ার কিছু দিক গ্রহণ এবং অন্যান্য অনেক বিধানকে বিশ্বাসগত দিক থেকে বর্জন করা।
(ঘ) যুগের চাহিদা অনুসারে ইসলামী শরীয়া আইনের সংস্কার সাধন করা।
(ঙ) কুরআন-হাদীসে বর্ণিত জিহাদের বিরোধিতা করা।
(চ) বাকস্বাধীনতার আলোকে ইসলামী বিধানের সমালোচনাকে বৈধতা দান করা।
(ছ) ধর্ম অবমাননা ও ধর্মত্যাগ বিষয়ক ইসলামী আইনের কঠোর বিরোধিতা করা।
(জ) রাসূলের নামে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়াকে বাকস্বাধীনতা হিসেবে সাহজিক করে দেখা।
(ঝ) হাদীসে বর্ণিত প্রতিটি কর্ম ও বক্তব্যকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে না দেখা।
(ঞ) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শতভাগ সমর্থন ব্যক্ত করা।
(ট) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে কোটা ব্যবস্থার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের পদোন্নতি দান করা।
(ঠ) সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী হওয়া।
(ড) মুক্তবিশ্বাস ও ধর্মান্তরিত হওয়ার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হওয়া।
(ঢ) রাষ্ট্র পরিচালিত হবে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে, এখানে ইসলামী শরীয়ার কোনো ভূমিকা নেই– এমন বিশ্বাস লালন করা।
(ণ) ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করা।
(ত) রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সাথে কুরআনী বিধানের যে কোনো সম্পৃক্ততাকে অস্বীকৃতি জানানো।
(থ) পর্দাব্যবস্থার বিরোধিতা করা।
(দ) ব্যভিচার আইনে ইসলামী রজমব্যবস্থার বিরোধিতা করা।
(ধ) নারীদেরকে নিজেদের মত করে জীবন যাপনের উন্মুক্ত স্বাধীনতা দেয়া।
(ন) বিবাহবহির্ভূত যৌনস্বাধীনতায় বিশ্বাসী হওয়া।
(প) জিহাদকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ হিসেবে বিশ্বাস করা।
(ফ) ধর্মনিরপেক্ষবাদী হওয়া।
(ব) ইসরাঈল রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা।
(ভ) বহুধর্মীয় সমাজব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করা।
(ম) সকল ধর্মকে সমান ও সত্য মনে করা।
(য) আমেরিকা কর্তৃক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে প্রয়োজনীয় মনে করা।

(র) সমকামিতাকে বৈধতা দেয়া।
(ল) পশ্চিমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকে প্রয়োজনীয় মনে করা।

এ হলো, মডারেট ইসলামের বৈশিষ্টাবলি। এ বৈশিষ্ট্যাবলি কেউ ধারণ না করলে সে মৌলবাদী, চরমপন্থী এবং উগ্রবাদী হয়ে যাবে। এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি এ বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করে মডারেট মুসলিম হবো, নাকি এগুলো কঠোরভাবে বর্জন করে মৌলবাদী ও চরমপন্থী মুসলিম হবো? দেখুন, ইসলাম গ্রহণের জন্য দীনের আবশ্যকীয় প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হয়। কোনো একটি বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি বা সংশয় থাকলে ব্যক্তি কখনো মুমিন হতে পারে না। তদ্রূপ মুসলিম হওয়ার পর কাফের হওয়ার জন্য দীনের প্রতিটি বিষয়কে অস্বীকার করতে হয় না; বরং যে কোনো একটি বিষয়ের অস্বীকৃতিই ঈমানহারা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন উযূ সম্পন্ন করতে হলে অন্তত চারটি অঙ্গ ধৌত করতে হয় কিন্তু উযূ ভঙ্গ হওয়ার জন্য উযূভঙ্গের যে কোনো একটি কারণই যথেষ্ট। মডারেট ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখুন। এ বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে কি কেউ মুসলিম থাকতে পারে? ঈমানহারা হওয়ার জন্য কি সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ধারণ করা জরুরী? না, বরং যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেই ঈমানহারা হয়ে যেতে হবে। এজন্য বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের খুব ভাবা প্রয়োজন।

মডারেট ইসলাম প্রচার-প্রসারে র‍্যান্ডের প্রস্তাবনা

(১) মডারেট মুসলিমদের লেখা বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার করা।
(২) সাধারণ জনগণ বিশেষত যুবশ্রেণীর জন্য বই-পত্র রচনা করতে মডারেট মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা।
(৩) মডারেট মুসলিমদের মতাদর্শকে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।
(৪) মুসলিম জনগণের মধ্যে সুফিবাদকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
(৫) জিহাদ নামের সহিংস কর্মকাণ্ডের অশুভ পরিণতি জনসমক্ষে তুলে ধরা।
(৬) মৌলবাদী, চরমপন্থী এবং মুজাহিদ নামের সন্ত্রাসীদের প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন না করা এবং তাদের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা।
(৭) মৌলবাদীদেরকে জনগণের সামনে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করা।
(৮) মৌলবাদী শ্রেণীর ব্যক্তি বা দলের অনৈতিক বিষয়াদি অনুসন্ধান করে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা।
(৯) মৌলবাদী শ্রেণী মুসলিমদের মাঝে নানা কৌশলে দলাদলী ও বিভাজন সৃষ্টি করা।
(১০) ইসলামপূর্ব জাহিলী সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা।

ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট তাদের এক নিবন্ধে প্রস্তাবনাগুলোকে আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে গুছিয়ে এভাবে বলেছে, ‘মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য যে কোনো উপায় গ্রহণ করতে হবে। এমনকি মিউজিক, কৌতুক, কবিতা, ইন্টারনেট প্রভৃতি মাধ্যমে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণযোগ্যভাবে গোটা আরব তথা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে।’ এ উদ্দেশ্যে তারা অনেকটাই সফল। তাদের সাধনার ফলে আরবের বাদশাহরা আজ মডারেট ইসলামের নামে ভ্রষ্ট ইসলাম বাস্তবায়নের কথা বলছে এবং তদানুযায়ী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলছে।

আমাদের দায়বদ্ধতা ও করণীয়

ইসলামে অনেক মত-অমত আছে। অনেক মতভিন্নতা আছে। সে সব মত-অমত ও মতভিন্নতার কারণে মুসলিমরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছে। শাখাগত দিক থেকে এসব শ্রেণীভাগ সহনীয় ও স্বাভাবিক। মূল বা উসূলগত দিক থেকে এ শ্রেণীভাগে সহনীয়তার সুযোগ নেই। মূলটাকেই কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরতে হয় এবং মূলের বিপরীতটাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখান করতে হয়। মূলগত এ জাতীয় শ্রেণীবিভাজনের অনেকগুলোই আছে আপতিক। কিন্তু মডারেট ইসলাম বা মডারেট মুসলিম জাতীয় বিভাজনটা আপতিক নয়; বরং একটি বিশেষ মহল থেকে চাপিয়ে দেয়া বিভাজন। এর জন্য রয়েছে বৈশ্বিক বিশেষ কর্মতৎপরতা ও বিপুল অর্থায়ন। এ বিভাজন বেশ ভয়ঙ্কর। এ বিভাজনে স্বজাতিদের দ্বারাই অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়িত হয়। এ জায়গাটাতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পলিসি গ্রহণ করা হয়। ঘরের শত্রু বিভীষণের বিষাক্ত অস্ত্রটি এখানে সুনিপুণভাবে ব্যবহৃত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামের মূল আদর্শিক চেতনা লালনকারী মুসলিমরা স্বজাতি মুসলিমদের দিক থেকে নানামাত্রিক যে বৈরিতা ও বিরোধিতার শিকার হচ্ছে তার সিংহভাগই মডারেট ইসলাম কেন্দ্রিক অ্যাজেন্ডার নিপুণ বাস্তবায়ন। মৌলবাদী, চরমপন্থী, সেকেলে, ধর্মান্ধ, উগ্রবাদী, ইসলাম শান্তির ধর্ম, তরবারির জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ইসলাম অর্থ শান্তি, মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ইসলামী আইনের হদ ও কিসাস বিধান হলো নির্মম বর্বরতা, সকল ধর্মকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে হবে, আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনাসভা, আন্তঃধর্মীয় শান্তি সম্মেলন, কোয়ান্টাম মেথড– প্রভৃতি শব্দ, বাক্য, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সবই মডারেট ইসলামের তৈরি করা একেকটি ঈমানঘাতী মারণাস্ত্র।

মডারেট ইসলাম একটি প্রশস্ত প্লাটফর্ম। এখানে নাস্তিক, কাফের, যিন্দিক, খণ্ডিত ইসলামের ধারক সকল পক্ষেরই জায়গা আছে। মডারেট মুসলিমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো র‍্যান্ডের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে তাতে একজন মডারেট ইসলামের ধারককে কোনোভাবেই মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই। মডারেট ইসলাম হলো মুসলিমদেরকে অমুসিলম বানানোর এক ভয়ঙ্কর পন্থা। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, পাগড়ী-জুব্বা পরিহিত অনেক দীনদার(?) শ্রেণীর মাঝেও মডারেট ইসলামের চিন্তাগুলো জেঁকে বসে আছে। দাওয়াত-তাবলীগ কিংবা তাযকিয়া-তাসাওউফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও সংশ্লিষ্ট থেকেও অনেকে ভিতরে ভিতরে ধারণ করেন মডারেট ইসলামের ঈমানবিধ্বংসী বিষবাষ্প। কালেভদ্রে তাদের কথায়-লেখায় বেরিয়ে আসছে সেসব বিষমাখা চিন্তার স্ফূলিঙ্গ।

আমরা দুর্বল। দীনের সকল শাখা নিয়ে হয়তো আমরা জোরালোভাবে কাজ করতে পারি না। কর্মের ময়দানে হয়তো আমরা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে রূপ দিতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস ও চিন্তার জায়াগাটাতে তো ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের কর্মের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা চিন্তা ও বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা তৈরি করে। কোনো একজন ব্যক্তি দীনের কোনো একটি শাখার মাধ্যমে দীনের পথে এলো। দেখা গেলো সে একসময় ইসলামের নির্দিষ্ট ওই শাখাটাকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করে বসলো। বস্তুত মডারেট ইসলামের চিন্তাগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থাগত দুর্বলতার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে জেঁকে বসে।

(৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রন্থ পরিচিতি

آپ بیتی আপবীতী

(শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর আত্মজীবনী)

[জন্ম: ১৩১৫ হি. ১৮৯৮ ঈ., মৃত্যু: ১৪০২ হি. ১৯৮২ ঈ.]

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

গ্রন্থ ও গ্রন্থাকার:

'শাইখুল হাদীস' সম্মান ও সফলতার হীরক-উপাধি। পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয় আজ 'শাইখুল হাদীস' শব্দ শোনামাত্র শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়। এই শ্রদ্ধা যার হাত ধরে আমাদের ঘরে এসেছে তিনি শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.। এই উপাধি তার নামের সঙ্গে মিশে তার রচনাবলীর হাত ধরে ঘুরেছে সভ্যপৃথিবীর অসংখ্য জনপদ, অগণিত দেশ-মহাদেশ। অকাতরে বিলিয়েছে হেরার দ্যুতি, মুহাম্মদী আদর্শ এবং ভালোবাসার মোহন সৌরভ। মমতায় জয় করেছে কোটি কোটি মানুষের তৃষ্ণার্ত হৃদয়-মন। কলম ও কালির ইতিহাসে এ জয় অনন্য; এই বিপ্লব অভাবিত!

যে লেখক কাল থেকে কালান্তরে পাঠককে মুগ্ধ, তৃপ্ত ও ভক্ত করে রাখেন তার ভিত্তি-বুনিয়াদ হয়ে থাকে শেকড়স্পর্শী। শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রহ.-এর ভিত্তি-বুনিয়াদ এমনই ছিল। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১০৬টি। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ৫৪টি। তার একাধিক গ্রন্থ পৃথিবীর ১৭টি অভিজাত ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ও পরিচিতিমূলক বই প্রকাশিত হয়েছে ৩ খণ্ডে।

কুরআন, তাফসীর ও হাদীসের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন ছিল নখদর্পণে, তেমনই ইসলামের বর্ণাঢ্য ইতিহাস ছিল তার নিত্যপাঠ্য। দর্শন যেমন তার পাঠ্যভুক্ত ছিল, ছিল সাহিত্যও। হাজারো অমর মনীষীর জীবন যেমন তার চর্চার বিষয় ছিল, তেমনই তার পড়ার টেবিল পূর্ণ করে রেখেছিল হাজার বছরের দেশি-বিদেশি বিচিত্র গ্রন্থাবলী। রুদ্ধদ্বার পাঠ ছিল তার খাদ্যাভ্যাসের চাইতেও অধিক প্রিয়। সময়কে কীভাবে নষ্ট করতে হয়, সে বিদ্যা তার শেখা হয়নি মরণ অবধি। পূর্বসূরী মনীষীদের সকল সৌন্দর্য শুষে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে নির্মাণ করেছিলেন স্বীয় জীবন। তার রচনাবলী সেই সৌন্দর্যের বিম্বিত আরশি। তাই তার প্রতিটি রচনাই আমাদের মুগ্ধ করে অকৃত্রিম স্বাদে। তন্মধ্যে 'আপবীতী' যেন খোদার সেরা দান।

'আপবীতী' মানে আত্মকথা! নিচে ছোট্ট করে লেখা– 'ইয়াদে আয়্যাম'-অতীতের স্মৃতিকথা'। উপমহাদেশের হাজার হাজার পাঠমনস্ক আলেমের প্রিয় বই আপবীতী। অনেক বিজ্ঞজনকে দেখা যায় মেধাবী শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিচ্ছেন– 'আপবীতী না পড়ে সত্যিকারের ছাত্র হতে পারবে না।'

কী আছে এই আত্মকথার গ্রন্থে তা এককথায় বলা মুশকিল। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়– 'মুহাম্মদ যাকারিয়া' কীভাবে 'শাইখুল হাদীস যাকারিয়া' হয়ে উঠলেন তার এক সরল মানচিত্র আপবীতী। আর অ্যাকাডেমিক ভাষায় বলতে গেলে– এতে আছে শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রহ.-এর শৈশব, কৈশোর, শিক্ষা-দীক্ষা, লেখালেখি, অভ্যাস-চরিত্র এবং জীবনব্যাপী বয়ে যাওয়া নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা। আছে তার রীতিনীতির আমল-আচরণ এবং নিজ চোখে দেখা কুদরতের বিস্ময়কর উপাখ্যান। তার প্রতি তার কালের মাশায়েখে কেরামের অতুল স্নেহাশীষ, বিশ্বময় সফর এবং ভারত-ভাগের ঘটনাবলী যথার্থ সমাদরে ঠাঁই পেয়েছে এই গ্রন্থে। তাছাড়া তাসাওউফ, ইখলাস, যুহদ-এর মর্মবাণী যেমন তার প্রাঞ্জল বর্ণনায় মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণ চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে; তেমনই ঝর্নাধারা মতো ছন্দ ছড়িয়েছে পূর্বসূরী মনীষীগণের জ্ঞানমগ্নতা ও পরকালমুখিতার ঘটনাবলী। এককথায় হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর এই আত্মকথা দীর্ঘ ইতিহাস ও অসংখ্য মনীষীর জীবনীনির্যাস, যাকে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষও বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বিষয়-বিন্যাস

উর্দু ভাষায় রচিত ৭খণ্ডের দুই ভলিয়মে এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে লেখক এভাবে বিন্যস্ত করেছেন–

প্রথম খণ্ডে রয়েছে হযরতের প্রাথমিক জীবনের অভিনব তরবিয়ত, শিক্ষণীয় অবস্থার বিবরণ, ক্রমবিকাশের ঘটনাবলী। এগুলো সকল আলেম ও তালিবে ইলমের জন্য অনুপম আদর্শ ও অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ পয়গাম।

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে দুটি অধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে তাসাওউফ সম্পর্কে মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের প্রশ্নাবলীর হৃদয় শীতলকারী জবাব এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ইখলাসের বরকতসহ গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়। ২য় অধ্যায়ে হযরতের রমাযানুল মুবারকে কুরআন তিলাওয়াতের মামুল, তাদরীস ও বাযলুল মাজহুদ রচনা শুরু, আলীগড়ের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, শাইখুল হাদীস উপাধি লাভ, মদীনা তাইয়িবার ছদর মুদাররিসের পদ এড়িয়ে যাওয়া এবং শায়খের রচনাবলীর আলোচনা।

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে দু'টি অধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সফরের প্রতি অনীহা, সুপারিশ না করার মানসিকতা এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ইত্যাদি বিষয়াবলী। আর ২য় অধ্যায়ে দুর্ঘটনা, বিবাহ-শাদী, হযরতের আব্বাজান ও আম্মাজানের ইন্তেকাল এবং সমকালীন মনীষীদের ইন্তেকালের ঘটনা ও দাফনের ব্যাপারে হযরতের অসিয়ত ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে দু'টি অধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে হযরতের তাহদীসে নেয়ামত তথা শুকরিয়া হিসেবে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের বিবরণ। ২য় অধ্যায়ে হযরতের হজ্জের বিবরণ।

পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে দু'টি অধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে ভারত-বিভক্তির বিস্তারিত আলোচনা। ২য় অধ্যায়ে বিবিধ আলোচনা।

ষষ্ঠ খণ্ডে রয়েছে ১৭টি পরিচ্ছেদ। ১ম পরিচ্ছেদে আকাবিরের শিক্ষাদানপদ্ধতি। ২য় পরিচ্ছেদে ছাত্রদের তরবিয়ত ও তার গুরুত্ব। ৩য় পরিচ্ছেদে ইলম অর্জনে আকাবিরের একাগ্রতা। ৪র্থ পরিচ্ছেদে মামুলাতের প্রতি আকাবিরের পাবন্দী। ৫ম পরিচ্ছেদে কুরআন-হাদীসের উপর আকাবিরের আস্থা। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বেতন-ভাতাকে কাজের চেয়ে বেশি মনে করা। ৭ম পরিচ্ছেদে পরিবেশের প্রভাব। ৮ম পরিচ্ছেদে আকাবিরের মেহনত-মুজাহাদা। ৯ম পরিচ্ছেদে আকাবিরের ক্ষুধা, দরিদ্রতা ও অভাব-অনটনের বিবরণ। ১০ম পরিচ্ছেদে আকাবিরের তাকওয়া ও পরহেযগারী। ১১তম পরিচ্ছেদে দুনিয়াদারদের সঙ্গে

আকাবিরের সম্পর্কনীতি। ১২তম পরিচ্ছেদে আকাবিরের বিনয়-নম্রতা। ১৩তম পরিচ্ছেদে আকাবিরের ধী-শক্তি। ১৪তম পরিচ্ছেদে আকাবিরের কারামত। ১৫তম পরিচ্ছেদে সমালোচনা ও পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে আকাবিরের কর্মপন্থা। ১৬তম পরিচ্ছেদে বিবিধ বিষয়। ১৭তম পরিচ্ছেদে আকাবিরের তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি।

সপ্তম খণ্ডে রয়েছে হযরতের হিন্দুস্তান থেকে হেজায সফর, হেজাযে স্থায়ী অবস্থান, আবার হেজায থেকে হিন্দুস্তান সফর ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা।

বৈশিষ্ট্যাবলী:

এ গ্রন্থের একটা অদ্ভুত শক্তি হলো, ছাত্র-শিক্ষক, নবীন-প্রবীণ সকলকেই টানে সমান আকর্ষণে। সকলের জন্যেই পাথেয় ছড়িয়ে আছে এর পাতায় পাতায়। সফল ও উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্নে আপসহীন একজন শিক্ষার্থী তার চিন্তার নির্মাণ ও লক্ষ্য নির্ণয়ে যেমন দ্বিধাহীন নির্দেশনা পেতে পারে এই গ্রন্থে, তেমনই কুড়িয়ে নিতে পারে লক্ষ্যজয়ের পাথেয়। পথহারা পান্থ কিংবা দিকহারা নাবিক যেমন আকাশের তারা দেখে খুঁজে নেয় মনজিল, কালের উড়ন্ত ধুলোয় উদ্ভ্রান্ত হেরার পথিকও তেমনই এখানে এসে খুঁজে পায় রাজপথ।

তিনি সারা জীবন ভেবেছেন, কেঁদেছেন জাতির কাণ্ডারী উলামা-তলাবাকে নিয়ে। এ কাফেলাকে সাধনায়, স্বপ্নে, চিন্তায়, বিশ্বাসে, আদর্শে ও শপথে বলীয়ান করে তোলার লক্ষ্যে শুনিয়েছেন সেই শক্তি ও রসে জারিত সব গল্প। দীক্ষার শাসনকে যারা জুলুম-নির্যাতন মনে করে তাদের ভুল ভাঙাবার জন্যে শুনিয়েছেন প্রিয় পিতার হাতে প্রহৃত হওয়ার নানা গল্প। আর ওই অগুনে পোড় খেয়েই যে খাঁটি সোনা হয়েছেন সে কথাও বলেছেন পরম কৃতজ্ঞতায়। দু'টি উদাহরণ দিই–

এক. হযরত শাইখুল হাদীস রহ. লিখেছেন– "আমার বয়স তিন কি চার বছর। তখনো ভালো করে চলা-ফেরা করতে শিখিনি। অথচ সেই ঘটনা, সেই দৃশ্য এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। আমার মা– তাঁর কবরকে আল্লাহ তা'আলা নূরান্বিত রাখুন– আমাকে খুব ভালোবাসতেন। সব মা-ই তার সন্তানকে ভালোবাসে। তবে আমার মা আমাকে যতটা ভালোবাসতেন অতটা ভালোবাসতে আমি কমই দেখেছি। ওই বয়সে আমার মা আমার জন্য একটি ছোট বালিশ বানিয়েছিলেন। কতটুকু আর হবে! আধহাত প্রস্থ আর পৌনে একহাত দৈর্ঘ্য। পুঁতি লেস ও জরির অলঙ্করণে বর্ণিল। শুভ্র ঝালরবিশিষ্ট লালবর্ণের কভার-আচ্ছাদন! এককথায় দারুন নজরকাড়া। বালিশটা আমার এতই প্রিয় ছিল যে, মাথার নিচে নয় আমার বুকের উপর ছিল তার স্থান। মাঝে-মধ্যে আদর করতাম, বুকে জড়িয়ে ধরতাম। আব্বাজান একবার ডেকে বললেন– যাকারিয়া! বালিশটা আমাকে দিয়ে দাও! আমার মধ্যে পিতৃপ্রেম উথলে উঠল। আমার দৃষ্টিতে মহাবিসর্জন বরং আপন আত্মাটি তুলে দেয়ার আবেগ নিয়ে বললাম– میں اپنا تکیہ لے آؤں؟ অর্থাৎ আমার বালিশটা নিয়ে আসবো?

বললেন– এদিকে আয়! আমি প্রবল আবেগে এই ভেবে ছুটে গেলাম যে, বাবা হয়তো পুত্রের এই মহৎ স্বভাব ও বিসর্জন দেখে মুগ্ধ হবেন। কাছে যেতেই তিনি তার বামহাতে আমার হাতদু'টি ধরে ডানহাতে আমার মুখে এমন জোরে থাপ্পড় কষলেন– যার স্বাদ আজও পর্যন্ত ভুলিনি এবং আশাকরি মরণ পর্যন্ত ভুলব না। তিনি আমাকে থাপ্পড় দিয়ে বললেন– বাবার সম্পদ হাতে নিয়ে বলছো 'আমারটা'! আগে কামাই করো, তারপরে বলো 'আমার'। আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও মেহেরবানী, এর পর থেকে যখনই এই ঘটনা মনে পড়ে, অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে যে, দুনিয়াতে আসলেই 'আমার' বলতে কিছু নেই। আল্লাহর শোকর, প্রতিনিয়তই এই বিশ্বাস শক্ত-পোক্ত হচ্ছে।"

দুই. হযরত শাইখুল হাদীস রহ. লিখেছেন– "হিজরী '৩০ সালের শুরু। আমার বয়স তখন ১৫ বছর। আমার মা তখন কান্ধালায় এবং মারাত্মক অসুস্থ। প্রতিটি দিনই ছিল তাঁর জীবনের শেষদিন। মা বারবার আমাকে দেখতে চাচ্ছিলেন। আব্বাজান যখন আমার মায়ের এই নাযুক অবস্থা এবং আমাকে দেখার জন্য তাঁর আকুলতার কথা জানতে পারেন– তিনি বুঝতে পারেন, আমি কান্ধালা গেলে অন্তত পাঁচ-সাতদিন থাকতে হবে। তিনি আমাকে কান্ধালায় পাঠালেন ঠিক, কিন্তু এতগুলো কাজ চাপিয়ে দিলেন যে, দৈনিক ১৬ ঘণ্টায়ও তা সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিদিন তারিখ মতো অভিধান ঘেঁটে মাকামাতের ১০০টি শব্দের তাহকীক ও বিশ্লেষণ লিখে তার তরজমা লেখা; ফুফা রাজিউল হাসান ছাহেবের কাছে সুল্লামুল উলূম পড়া; প্রতিদিন এক মনজিল কুরআনে কারীম দুই-তিনবার পড়ে দাদী ছাহেবাকে শোনানো। তারপর গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ ও ইউসুফ-জুলেখার তিনটি ফার্সী সবক হাজী মুহসিন রহ.-কে পড়ানো। এই ছিল আব্বার বেঁধে দেয়া মাকে দেখতে আসার ছুটিকালীন রুটিন।"

শাইখুল হাদীস রহ. এই গ্রন্থে শুধু যে তার জ্ঞান-সাধনার গল্প বলেছেন তা নয়; আকাবির মনীষীদের সাধনা, অর্জন ও বিসর্জনের গল্পও বলেছেন হৃদয়জাত ভঙ্গিতে, কান্ধালার বিধৌত আবেগে এবং শীলিত গদ্যে। 'আকাবির-কা তলবে ইলম মে ইনহেমাক' তথা জ্ঞানসাধনায় পূর্বসূরীদের নিমগ্নতার গল্পগুলো পড়ার সময় মনে হয় যেন ভালোবাসার একেকটি হৃৎকমল! কী তার শোভা! কী তার সুবাস!! হযরত গাঙ্গুহী রহ., হযরত নানুতবী রহ. থেকে নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. পর্যন্ত কতজনের নামে, গল্পে, রূপে, নূরে, সুবাসে আমোদিত উদ্ভাসিত ও জোছনাস্নিগ্ধ এই গ্রন্থ! দু'টি গল্প উদ্ধৃত করছি–

এক. হযরত শাইখ লিখেছেন– "আমার আব্বা তখনও ছাত্র। চিকিৎসকগণ বলেছেন, এর চোখে পানি নামতে শুরু করেছে। সুতরাং পড়াশোনা একদম বন্ধ। একথা শোনার পর আব্বাজান এই ভেবে পড়াশোনায় ডুবে যান যে, চোখ তো চলেই যাবে, যা পড়ার পড়ে নিই! ওই সময় মাদরাসা হুসাইন বখশ-এর কর্তৃপক্ষ আমার দাদাজানকে পীড়াপীড়ি শুরু করেন, আব্বাজান যেন তাদের মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন। আব্বাজান ভর্তি হতে রাজি হননি, তবে পরীক্ষার আবেদন কবুল করে নেন। এ উদ্দেশে নিযামুদ্দীনের অপরিসর একটি কক্ষে আব্বাজান স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হন। ছোট্টকক্ষ, বনের দিকে একটি দরজা। এক-দু'জন ছাত্র নির্দিষ্ট করা ছিল; তারা আযানের পর উযূ-ইস্তেঞ্জার জন্যে এক-দুই বদনা পানি আর জানালা দিয়ে দুই বেলা রুটি পৌঁছে দিত। আব্বাজান নিশ্ছিদ্র মনোযোগে ওই কক্ষে সারাক্ষণ পড়াশোনা করতেন। এই সময় বাড়ি থেকে বিয়ে-শাদি বিষয়ে নিযামুদ্দীনে আব্বাজনের ঠিকানায় চিঠি পাঠানো হয়। নিযামুদ্দীনের দায়িত্বশীলগণ এই বলে চিঠি ফেরত পাঠান যে, কয় মাস হলো ইয়াহইয়া এখানে নেই!!!

আব্বাজান সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন– আমি এই পাঁচ-ছয় মাসে সহীহ বুখারী, সীরাতে ইবনে হিশাম, তহাবী শরীফ, হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর এতটাই মগ্নতার সাথে পড়েছি যে, পরীক্ষক হযরত সাহারানপুরী রহ. বিশাল মজলিসে আমার প্রশংসা করেন। এরই ভিত্তিতে তিনি হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে সুপারিশ করেন এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ. সর্বশেষ দাওরা আমাদেরকে পড়ান।"

দুই. "হযরত মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. আমাদের ইতিহাসের নক্ষত্র। তিনি বলেছেন, শীতের হিমেলবায়ু আর গ্রীষ্মের আগুনঢালা রোদে দিনে দুইবার দিল্লীর মাদরাসায় যেতাম। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল পথ। দুপুরে ঘরে এতটুকু সময় কাটাতাম, যেন স্বাভাবিক সুস্থতা ধরে রাখার জন্যে কয়েক লোকমা মুখে নেয়া যায়। মাঝেমধ্যে সাহরীর আগেই মাদরাসায় চলে যেতাম। সকাল পর্যন্ত বাতির সামনে বসে এক 'জুয' লেখা শেষ করতাম। আজব ব্যাপার হলো, সারাক্ষণ অধ্যয়ন, পাঠপর্যালোচনা ও বাহাস-বিতর্কে ডুবে থাকার পরও পঠিত ব্যাখ্যা ও টীকায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী লিখে রাখা জরুরী মনে করতাম। আমার মা-বাবা বলতেন, রাতে যথাসময়ে ঘুমিয়ে পোড়ো, দিনের বেলা কিছু সময় বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা কোরো। আমি বলতাম– খেলাধুলা তো মনের আনন্দের জন্যেই করা হয়। আমি আনন্দ পাই লেখা এবং পড়ায়।"

আজমের পাশাপাশি আজ আরবজাহানও শাইখ যাকারিয়া রহ.কে জ্ঞানাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র মান্য করে; স্বীকৃতি দেয় যে, সত্যিই তিনি হাদীস শাস্ত্রের বরিত ইমাম। আর আপবীতী আমাদেরকে জানাচ্ছে তার আকাশের উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রহস্য!

ভাষান্তর:

উর্দু ভাষায় রচিত ৭ খণ্ডে সমাপ্ত 'আপবীতী' এ পর্যন্ত ইংরেজীসহ আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়ে সুধীমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক মাওলানা হাবীবুর রহমান (করীমগঞ্জ); মুহাদ্দিস– মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর পল্লবী, ঢাকা। সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা হাবিবুর রহমান দা.বা.; শাইখুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ। এটি প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আলকাউসার প্রকাশনী' থেকে ঝকঝকে কাগজে দুই ভলিয়মে ছেপেছে। এতে আপবীতীর ১ম খণ্ড থেকে ৫ম খণ্ড প্রথম ভলিয়মে, আর ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্বিতীয় ভলিয়মে ছাপা হয়েছে। ৭ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ এখনো বাকি রয়েছে। কোন আল্লাহর বান্দা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও মূলানুগ। পড়তে গিয়ে পাঠককে হোঁচট খেতে হয় না। সাধারণ অনুবাদে যেমন অনুবাদের রসই প্রধান হয়ে ওঠে, এ গ্রন্থ তার ব্যতিক্রম। তার রচনাশৈলীর গুণে অনুবাদও মৌলিক রচনার মতোই স্বচ্ছ, সাবলীল। তিনি কোথাও বিষয়াতিরিক্ত অতিশায়ন কিংবা রসহীন তরজমা করার প্রয়াস পাননি। ভাষা তার আয়ত্বে থাকায় সর্বত্র একটা কোমল প্রলেপের আবেশ তরজমার মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটেছে। এছাড়া বাংলা বানানরীতি, প্রতিবর্ণায়ন, ব্যাকরণসিদ্ধতা, শব্দপ্রয়োগ ও প্রয়োগবাহুল্য– এ সবের প্রতি এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি সাধারণত লেখকদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। এ কঠোর কাজটি অন্তর্দৃষ্টি ও একাগ্রতার সাথে তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। এ কর্মে তার মেধা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও একাগ্রতা পাঠককে অভিভূত করবে।

মোটকথা 'আপবীতী' সহজ-সরল ভাষায় সুলিখিত একখানা সুখপাঠ্য গ্রন্থ। বাংলাভাষাভাষী পাঠক গ্রন্থখানা পাঠে এক মোহময় জগতের আকুল আহ্বানে ভাবলোকে বিচরণ করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহামনীষী শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর আত্মজীবনী 'আপবীতী' বারবার পাঠ করে সুন্দর ভবিষ্যত বিনির্মাণে আকাবিরে দেওবন্দের যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আ-মীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

লেখক: শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, যশোর।

(৩৭ পৃষ্ঠার পর : মডারেট ইসলাম...)

আসলে আমাদের দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই মডারেট ইসলাম তৈরির একটি বৃহৎ আঁতুড় ঘর। একজন শিক্ষার্থী যদি কোনো আলেম বা দীনদারের সান্নিধ্য না পায় তাহলে সে এ শিক্ষা সমাপনান্তে অটোমেটিক মডারেট ইসলামের ধারক হয়ে বের হয়ে আসবে। পশ্চিমা ভাবধারার খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ মুসলিম তৈরির জন্যই মূলত তারা এ সিলেবাস তৈরি করে দিয়ে গেছে। সুতরাং এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রকৃত মুসলিম আশা করা বা এ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে ইসলামবান্ধব বক্তব্য কামনা করা বেতবৃক্ষ থেকে আম লাভ করার অদ্ভুত চাহিদার নামান্তর। সকল মুসলিম যেহেতু এ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে না বা যারা শিক্ষিত হচ্ছে তাদের সবার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল তারা পাচ্ছে না তাই তারা আয়োজন করে মডারেট মুসলিম নামে খণ্ডিত পুতুল মুসলিম তৈরির জন্য আঁটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছে।

সাধারণ মানুষ বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মানুষ নানা পন্থায় দীনের পথে আসছে। এটি একটি প্রশংসনীয় ইতিবাচক দিক। কিন্তু এ মানুষগুলো ইসলামের নির্দিষ্ট একটি ধারার আলোচনা শুনে শুনে বেড়ে উঠে ও উঠছে। উন্নতি ও সফলতার যে স্বপ্ন নিয়ে ব্যক্তিটি দীনের পথে এসেছে সে দীনের মূল ফাউন্ডেশন ঈমানটা কিসে থাকে আর কিসে যায় এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো শ্রবণ ও অধ্যয়ন করা থেকে তারা থেকে যায় বঞ্চিত। ফলে মডারেট মুসলিমদের চিন্তা ও বক্তব্যগুলোকে গ্রহণ করে নিতে তাদের বাধে না। অথবা আগে থেকে ধারণ করা মডারেট ইসলামের চিন্তা ও বিশ্বাসগুলো পরিত্যাগ করারও কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ফলে দেখা যায়, এরা ঈমান ও কুফরকে সমন্বয় করেই জীবনটা পার করে দেয়। ফলে যা হবার তাই হবে বা হয়।

দেশের মিম্বারগুলো থেকেও মডারেট ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয় না। ওয়াজ-বয়ানের বিস্তৃত মাঠেও এ বিষয়ক কোনো কথাবার্তা নেই। অথচ শিরোনাম না করেও ইতিবাচক ধারায় এ বিষয়ক বয়ান, আলোচনা করার সুযোগ এখনো বিদ্যমান আছে। ওয়াজ-বয়ানের ছোট বড় সকল চেয়ার-মিম্বারগুলো এ বিষয়ক আলোচনায় সরব হওয়া খুব প্রয়োজন। সাথেসাথে লেখনির ময়দানটাও এ বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এতে মডারেট ইসলামের এ বিষাক্ত ফেতনার মাত্রা আশা করি বহুলাংশে কমে আসবে।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসার ও নিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে তার সিকিভাগও মুসলিমরা করে বলে মনে হয় না। ইসলামকে রক্ষার দায়টা যেন নিছক আলেমদের কাঁধেই বর্তায়। সাধারণ মুসলিমদের যেন এ জায়গাতে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। অথচ প্রতিটি মুসলিমকেই তার আপন আপন জায়গা থেকে ইসলাম রক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। এ উপলব্ধি আজ মুসলিমদের মাঝে নেই। সাধারণ মুসলিমদের মাঝে এ উপলব্ধির জাগরণ প্রয়োজন। এর জন্য আলেম সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকায় এগিয়ে আসতে হবে। ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা যেমন আজ নানা মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামকে দ্বিখণ্ডিত করার মিশনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করছে আমাদেরও তদ্রূপ ইসলাম রক্ষায় এবং প্রকৃত ইসলাম প্রচার-প্রসারে নিজেদের সবটুকু দিয়ে কর্মের ময়দানে নেমে পড়তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

লেখক: আমীনুত তা'লীম, মাহাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

মাওলানা আবুল বাশার
আত-তাকওয়া মাদরাসা ও এতিমখানা

৪৪১ প্রশ্ন: বর্তমানে কওমী ঘরানার ও দেওবন্দী চিন্তাধারার অনেক হক্কানী আলেম ও পীর মাশায়েখকে স্ব-উদ্যোগে নিজেদের বয়ান ভিডিও করাতে দেখা যায়। আবার অনেকে নিজ উদ্যোগে ভিডিও না করালেও অন্য কেউ করলে নিষেধ করেন না। অথচ আমরা জানি, ইসলামে ভিডিও করা নিষিদ্ধ। এখন জানার বিষয় হলো–

(ক) এই নিষেধাজ্ঞাটা কোন পর্যায়ের? এক্ষেত্রে ছাড় গ্রহণের কোন সুযোগ আছে কিনা? কিংবা নিষেধাজ্ঞাটি উত্তম-অনুত্তমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা?

(খ) নিষেধাজ্ঞাটি যদি হারাম পর্যায়ের হয়ে থাকে তাহলে যে বক্তাগণ স্ব-উদ্যোগে নিজেদের বয়ান-ইত্যাদি ভিডিও করান তাকে কোনো মাহফিলে দাওয়াত দেয়া যাবে কিনা?

(গ) শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ কেমন হওয়া উচিত? বিস্তারিত দলীলসহ জানানোর আবেদন রইল।

উত্তর: (ক) শরীয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া যে কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা বা প্রতিকৃতি তৈরী করা হারাম। বর্তমানে প্রচলিত ডিজিটাল ছবি ও ভিডিও শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত কিনা, এ ব্যাপারে সমকালীন মুফতী সাহেবদের মাঝে যদিও মতভেদ রয়েছে, কিন্তু উপমহাদেশ ও আরববিশ্বের নির্ভরযোগ্য মুফতীদের মতে এটা হারাম ও নিষিদ্ধ। আর এ মতটিই প্রাধান্যযোগ্য এবং শরীয়তের রুচি ও চাহিদার উপযোগী। বিশেষ করে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য-সহ যে সব কারণে শরীয়ত ছবিকে হারাম করেছে, তা ডিজিটাল ছবি ও ভিডিওর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যে সকল মুফতী সাহেবের মতে প্রচলিত ডিজিটাল ছবি প্রিন্ট করার আগ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছবির অর্ন্তভুক্ত নয়, তাঁদের মতটি সাধারণ পরিভাষার বিপরীত হওয়ার পাশাপাশি ছবির উদ্দেশ্য ও বর্তমান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা পরিভাষায় ডিজিটাল ছবিকেও ছবিই বলা হয় এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্য ডিজিটাল ছবিতে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ হয়। সুতরাং ডিজিটাল ছবি, ভিডিও এবং অন্য ছবির মাঝে কোন পার্থক্য নেই; বরং সবগুলোই ছবি। আর সকল ছবির বিধানও এক। তাই শরীয়তসম্মত উযর ছাড়া এক্ষেত্রে ছাড় গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৫০, ৫৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৮৪৩০, উমদাতুল কারী ২২/৭০, শরহে নববী ১৪/৮১, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৭, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৯১, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৮৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৩৮৪, ৯/৮৮, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/৪৪০, চান্দ আহাম আছরী মাসায়িল ৩৩৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৯১)

(খ) যে সকল বক্তা স্বেচ্ছায় স্ব-প্রণোদিত হয়ে বিনা প্রয়োজনে ভিডিও করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মাহফিল ও জলসাগুলোতে জনসাধারণের লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশি হয়। এজন্য দীনী মাদারিস, মাহফিল ও জলসাগুলোতে জনসাধারণের ব্যাপক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তা দাওয়াত দেয়া উচিত। যে সকল বক্তা স্বেচ্ছায় স্ব-প্রণোদিত হয়ে বিনা প্রয়োজনে ভিডিও করা থেকে বিরত থাকেন তাদেরকে দীনী মাহফিলে দাওয়াত দেয়া চাই। তবে যে সকল আলেমে দীন জনসাধারণকে ভিডিও থেকে বারণ করা সত্ত্বেও তাদের এমন কিছু ভিডিও পাওয়া যায় যা তাদের অগোচরে করা হয়েছে তাদেরকে দীনী মাহফিলে দাওয়াত দিতে কোন অসুবিধা নেই। (সূরা সাজদাহ-২৪, তাফসীরে রূহুল মা‘আনী ১১/১৩৫, সূরা মুজাদালা-১১, তাফসীরে আবূ সঊদ ৮/২২০, আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ ফী শরহি সহীহি মুসলিম ২/৪০৫, আউনুল মা‘বূদ শরহে সুনানে আবূ দাঊদ ১/৪৯৩)

(গ) জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে, একজন আলেমে দীনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা। ব্যক্তিগতভাবে কোন আলেমে-দীনের সঙ্গে অসদাচরণ করা এবং তাঁর প্রতি অসম্মানবোধ দেখানো উচিত নয়। তাঁর কোন বিষয় নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের কাছে আপত্তিযোগ্য হলে এ আপত্তিকর কাজে তার অনুসরণ করবে না। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে তার অনর্থক সমালোচনা বা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। (শরহে মুশকিলুল আসার ১৩২৮, আত-তাইসীর বিশরহে জামেউস সগীর ২/৩৩১, আলমাদখাল ইলা ইলমিস সুনান; হাদীস ১৭৬৪, আলকাউকাবুল ওয়াহহাজ ২/৪০৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ৫/৩৫৩)

মুহাম্মাদ খালেদ সাইফুল্লাহ
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

৪৪২ প্রশ্ন: (ক) চশমা পরিধান করে নামায আদায় করার বিধান কী?

(খ) আল-কুরআনুল কারীমের কাব্য-অনুবাদের শরয়ী হুকুম কী?

(গ) দেশীয় ছেঁড়া বা পুরাতন টাকা দিয়ে নতুন টাকা কমবেশী করে আদান-প্রদান করা কি সুদী লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর: (ক) চশমা পরিধান করে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যদি সিজদা করতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয়, অর্থাৎ কপাল এবং নাক উভয়টি জমিনে লাগানো যায় তাহলে চশমা পরিধান করে নামায আদায় করা জায়েয। আর যদি অসুবিধা হয় অর্থাৎ কপাল এবং নাকের কোন একটি জমিনে লাগানো না যায় তাহলে চশমা পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরুহ হবে। তবে ওযর থাকলে এই সূরতে নামায আদায় করা যাবে। (আল-আসল লি-মুহাম্মাদ ১/২১০, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ১/৭০, আদ-দুররুল মুখতার ১/৬৪০, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৩/৫৫৩)

(খ) আল-কুরআনুল কারীমের কাব্য-অনুবাদ বৈধ নয়। ফুকাহায়ে কেরাম এ কাজ থেকে উম্মতকে বারণ করেছেন এবং এ ধরণের অনুবাদের ক্রয়-বিক্রয় ও প্রচার-প্রসার করাও নাজায়েয বলেছেন। (মাজমাউল আনহুর ২/৫০৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ২/২৬৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৮/৪৬৩-৪৬৮, ইমদাদুল আহকাম ১/২২৭)

(গ) হ্যাঁ, একদেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কমবেশী করা নাজায়েয ও সুদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দেশীয় ছেঁড়া বা পুরাতন টাকা দিয়ে নতুন টাকা কমবেশী করে আদান-প্রদান করা নাজায়েয। কারণ বর্তমানে কাগুজে নোটগুলোই আদান-প্রদানের মাধ্যম

হিসেবে স্বর্ণ-রূপার মুদ্রার স্থান দখল করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, ছেঁড়া-ফাটা বা পুরাতন নোট যদি চালানো সম্ভব না হয় তাহলে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবর্তন করে নিবে। অথবা দোকানদারকে বুঝিয়ে সমান টাকা নিবে এবং তার যেহেতু এটা পরিবর্তনের জন্য ব্যাংকে যেতে হবে তাই তাকে আলাদাভাবে কিছু পথখরচ দিয়ে দিবে। (বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা ১/১৬৭, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৫২০, জাদীদ ফিকহী মাসায়িল ৪/৪৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২০৮)

মুহাম্মাদ ইমরুল কায়েস
তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর ঢাকা।

৪৪৩ প্রশ্ন: (ক) আমি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। এখানে নারী-পুরুষ সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। যেমন একসাথে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে হয়, একসাথে খাওয়া-দাওয়া এবং একসাথে গাড়িতে যাতায়াত করতে হয়। জানতে চাচ্ছি, এভাবে চাকরি করা শরীয়তসম্মত কিনা এবং না হলে আমার করণীয় কী?

(খ) খাদ্যশস্য যেমন ধান, গম, চাল, ডাল ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যবসার জন্য সর্বোচ্চ কতদিন পর্যন্ত মজুদ করে রাখা যাবে? এবং খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য কৃষিপণ্য যেমন পাট ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যবসার জন্য সর্বোচ্চ কতদিন পর্যন্ত মজুদ করে রাখা যাবে?

উত্তর: (ক) পর্দা ইসলামী শরীয়তের একটি অকাট্য বিধান। কুরআন-হাদীসের বিধান মতে, পরপুরুষ ও পর-মহিলাদের মাঝে পর্দা করা ফরয। তাই যে প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের একত্রে কাজ করা বাধ্যতামূলক এবং সেখানে পর্দা রক্ষা করে চলার কোন পরিবেশও নেই, সে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। সুতরাং আপনি যদি শুধু এই চাকরির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন এবং এটা ছাড়া জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় না থাকে তাহলে এ মুহূর্তে চাকরি না ছেড়ে যথাসম্ভব দৃষ্টির হেফাজত করতে সচেষ্ট থাকবেন, পাশাপাশি আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকবেন এবং উপার্জনের জন্য কোন হালাল পন্থা অনুসন্ধান করতে থাকবেন। জীবিকা নির্বাহের মত কোন হালাল পন্থা মিলে গেলেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়ে নতুন উপার্জনের পথ গ্রহণ করবেন। (সূরা নূর-৩০, সূরা আহযাব-৫৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৩৪৩, তাফসীরে রূহুল মা'আনী ১৮/১৩৮, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হাদীস ১৩৫৬৬, সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ২১৪৯, রদ্দুল মুহতার ১/১০৬, ৬/৩৬৮, ৬/৩৬৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ৫/৩২৭, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/৮২, ৮/৯১, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/৩৯২)

(খ) খাদ্যদ্রব্য ও অন্য কোন মাল ব্যবসার জন্য মজুদ করা কয়েকটি শর্তে বৈধ আছে– ১. উক্ত খাদ্যদ্রব্য ও মাল স্থানীয় বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকা। ২. গুদামজাদ করার দ্বারা শহরে সংকট তৈরি না হওয়া।

২.পরবর্তি সময়ে বে-মৌসুমে সীমাতিরিক্ত চড়া মূল্যে বিক্রি না করা; বরং স্বাভাবিক লাভে বিক্রি করা। উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য ও মালামাল ব্যবসার জন্য মজুদ করা বৈধ আছে। এসব শর্ত না মেনে মজুদদারীর মাধ্যমে জনগনকে সংকটে ফেলা নাজায়েয ও গুনাহের কাজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ ২১৫৩, মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসী; হাদীস ৫৫, আদ-দুররুল মুখতার ৬/৩৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ৩/২১৩, হিদায়া ৪/৩৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/২৯১, ২৯৩, ৩৯৪)

মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন আহমাদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৪৪৪ প্রশ্ন: আমার নানা-নানী বেঁচে থাকা অবস্থায় আমার মা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর আমার নানা-নানীও ইন্তেকাল করেন। তারা মারা যাওয়ার সময় ওয়ারিস হিসেবে ছিলেন আমার মামা-খালা। জানার বিষয় হল–

(ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে আমরা কি নানা-নানী থেকে মীরাস পাবো?

(খ) সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আমরা নানা-নানী থেকে মিরাসের অধিকারী হই; কিন্তু আমাদের জন্য কি সেটা গ্রহণ করা জায়েয হবে?

(গ) এক্ষেত্রে কেউ যদি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মীরাস গ্রহণ করে থাকে, এখন তার করণীয় কী?

উত্তর: (ক) আপনার নানা-নানীর মৃত্যুর সময় যদি ওয়ারিস হিসেবে তাদের ছেলে জীবিত থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনারা নানা-নানী থেকে মীরাস পাবেন না।

(খ) এক্ষেত্রে সরকারী আইনে নানা-নানী থেকে নাতি/নাতনীদের মীরাস পাওয়ার নিয়মটি শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং এই নিয়ম অনুযায়ী নাতি-নাতনীদের জন্য নানা-নানী থেকে মীরাস গ্রহণ করা জায়েয হবে না; বরং গ্রহণ করলে মারত্মক গুনাহ হবে।

(গ) যদি কেউ নিয়ে থাকে তাহলে তার করণীয় হলো, সেটা মাইয়েতের শরয়ী ওয়ারিসদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এই ভুলের জন্য ওয়ারিসদের কাছে মাফ চাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। উল্লেখ্য, নানা-নানী বেঁচে থাকা অবস্থায় তাদের উচিৎ ছিল, নাতি-নাতনীদের হেবা হিসেবে কিছু দিয়ে যাওয়া। কেননা মীরাস থেকে বঞ্চিত নিকটত্মীয়দের হেবা হিসেবে কিছু প্রদান করতে শরীয়ত উৎসাহিত করেছে। অনুরূপভাবে নানা-নানীর মৃত্যুর মাধ্যমে মামা-খালা যখন এককভাবে সমুদয় সম্পদের ওয়ারিস হলো তখনও তাদের জন্য উচিৎ হলো, ভাগ্নে-ভাগ্নীদেরকে সম্ভব হলে কিছু সম্পদ বা অর্থ হেবা করা। তখন করে না থাকলে বর্তমানেও উক্ত হেবা করে সওয়াব অর্জনের সুযোগ রয়েছে। (সূরা আহযাব-৬, সূরা নিসা-৮, ১১, ১৩, ১৪, ২৯, সূরা মায়িদা-৫০, সূরা বাকারা-৭৫, সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৭৩২, সুনানে দারা কুতনী; হাদীস ২৮৮৫, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২০৬৯৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৬১১, ২৫৮১, ২৫৮২, ২৫৭৯, সিরাজী ৮/৩৫। ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ৬/৪৫০, আদ-দুররুল মুখতার ৫/৯৯, কিফায়াতুল মুফতী ৮/৩৩৭, আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল ৬/৩৮৫)

মুহাম্মদ আরিফ রায়হান
স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৪৪৫ প্রশ্ন: আমি একটি অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে কৃষি-বিজনেস করি। আমার ব্যবসার ধরণ হলো– প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সফটয়্যার মোবাইলে ইনস্টল করি। অ্যাপটি ওপেন করলেই সেখানে বিভিন্ন বীজের নির্ধারিত মূল্য ম্যানুয়াল আকারে প্রদর্শিত হয়। আমরা যখন বীজগুলো ক্রয় করার জন্য অ্যাপ কর্তৃপক্ষের কাছে অনলাইনে আবেদন করি, কর্তৃপক্ষ আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বিক্রয় বাবদ এর মূল্য কেটে নেয়। বিক্রয়ের পর অ্যাপ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে কোন প্রকার বীজ হস্তান্তর করার পূর্বেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুযারা'আ-এর ভিত্তিতে উক্ত বীজগুলো বিভিন্ন কৃষি প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, চাষাবাদ করে নির্দিষ্ট সময় পর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নির্দিষ্ট অংকে মুনাফা প্রদান করবে। আর আমাদেরকে এই মুনাফা পাওয়ার জন্য উক্ত সফটওয়্যারের নির্দিষ্ট স্থানে দৈনিক তিনবার ক্লিক করতে হবে। এতে ধরে নেয়া হবে যে, আমরা আমাদের ক্ষেতে

সেচকার্য করছি। আর যদি আমরা উক্ত কাজ না করি তাহলে ধরে নেয়া হবে যে পানি না দেয়ার কারণে আমাদের ক্ষেতে লোকসান হয়েছে; কাজেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা থেকে বঞ্চিত হবো।

উত্তর: নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে বীজ ক্রয়পূর্বক হস্তগত হওয়ার পূর্বেই মুযারাআর উল্লিখিত চুক্তি একাধিক কারণে নাজায়েয–

১. ক্রয়কৃত পণ্য হস্তগত হওয়ার পূর্বেই তাতে নতুন করে কোন আকদ যেমন, মুযারাআ ইত্যাদি করা জায়েয নেই।

২. সফটওয়্যায়ের মধ্যে বীজ ক্রয়ের পূর্বেই বিক্রেতা কর্তৃক মুযারাআর শর্তারোপ করা থাকে, আর এক লেনদেনের চুক্তির মাঝে অপর লেনদেনের চুক্তি শর্তারোপ করা শরীয়তে জায়েয নেই।

৩. মুযারাআর মধ্যে মুনাফা আনুপাতিক হারে হওয়া জরুরী। যেমন: এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি। নির্দিষ্ট অংকের মুনাফার উপর মুযারাআ চুক্তি জায়েয নেই। কেননা, লভ্যাংশ কম হওয়ার সূরতে শ্রমদাতা বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

৪. একপক্ষ কর্তৃক শুধু বীজ আর অপর পক্ষের জমি ও শ্রমের চুক্তিতে মুযারাআ নাজায়েয। কারণ, এখানে স্পষ্ট নয় যে, ভাড়াকৃত বস্তু জমি নাকি শ্রমিকের শ্রম?

৫. অ্যাপের নির্দিষ্ট স্থানে ক্লিক করাকে ক্ষেতে সেচকার্য নাম দেয়া ধোকার শামিল, যা জায়েয নেই। (মুসনাদে আবূ হানীফা ; হাদীস ১২৩৫, শরহে মুখতাসারে তহাবী ৩/৪২৩, আল-ইখতিয়ার ২/২৫, ইনায়াহ ৯/৪৬৫-৪৬৮ নাতফ ২/৫৫০, বাদায়িউস সানায়ে ৬/১৭৭)

ডা. মুহাম্মদ তানভীর আলী
সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা।

৪৪৬ প্রশ্ন: আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ৯৪টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট। অ্যাপার্টমেন্টের নিচ তলায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ রয়েছে, যা ওয়াকফকৃত নয়। উক্ত মসজিদে করোনাকালীন লকডাউন থেকে নিয়মিত জুমু'আর নামায পড়া হচ্ছে। এখন আমরা আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত মসজিদকে শরয়ী জামে মসজিদে রূপান্তর করতে চাচ্ছি। জানার বিষয় হলো, আমাদের জন্য কি এটি করা বৈধ হবে? এবং বৈধ হলে এর পদ্ধতি কী হবে দলীলসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। উল্লেখ্য, ৯৪টি ফ্ল্যাটের মধ্যে মুসলিম মালিকের অধীনে আছে ৮৩টি আর হিন্দু/বৌদ্ধ মালিকের অধীনে আছে ১১টি।

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত নামাযের স্থানকে শরয়ী জামে মসজিদে রূপান্তর করার জন্য শর্ত হল, সকল ফ্ল্যাটমালিক বা জমির মালিক মিলে উক্ত স্থানকে মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দেয়া কিংবা স্থায়ীভাবে নামাযের জন্য ওয়াকফ মর্মে লিখিত চুক্তিপত্র করে নেয়া। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যদি এ জায়গা মসজিদের জন্য দিতে সম্মত থাকে তাহলে তাদের তরফ থেকেও ওয়াকফ ধর্তব্য হবে। আর তারা ওয়াকফ করতে সম্মত না হলে তাদের আনুপাতিক অংশ মূল্য দিয়ে ক্রয় করে ওয়াকফ করতে হবে। ওয়াকফ না করলে এ স্থান শরয়ী মসজিদে রূপান্তরিত হবে না। সে ক্ষেত্রে জুমু'আসহ সকল নামাযই এখানে সহীহ হবে, কিন্তু শরয়ী মসজিদে নামায আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং ইতেকাফও শুদ্ধ হবে না। (সূরা জিন্ন-১৭, ইনায়াহ ৬/২৩৪-২৩৫, আল-মুহীতুল বুরহানী ৬/২০৭, তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/৩৩০, ৩/৩২৪, দুরারুল আহকাম ২/১৩৫, বাহর ৫/২৬৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/৪২৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৬৬৬-৬৬৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/১১৬-১১৭, ইমদাদুল আহকাম ১/৪৮৩, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৪৫৯)

রিযওয়ান হাসান
ঢাকা

৪৪৭ প্রশ্ন: সাধারণত ঔষধের দোকানের যাকাতের হিসাব করা কষ্টসাধ্য একটি কাজ। এতে অনেক সময় একমাসও সময় লেগে যায়। প্রত্যেকটি প্যাকেট খুলে খুলে দেখতে হয়, আবার অনেক সময় ভুলও হয়ে যায়। সুতরাং সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের জন্য সহজ পদ্ধতি কী হতে পারে?

উত্তর: যাকাত আদায় করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। এই বিধান সঠিকভাবে পালন করার জন্য লক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্য থেকে একটি জরুরী বিষয় হলো, সম্পদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব করা এবং এর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। আর হিসাব করার জন্য শরীয়তে নির্ধারিত কোন পদ্ধতি নেই; বরং প্রত্যেকে তার অভিজ্ঞতার আলোকে যে কোন সহজ পদ্ধতিতে হিসাব করতে পারে। তবে অনুমান করেও যাকাত দেয়া ঠিক নয়; তা-সত্ত্বেও কেউ যদি অনুমান করে যাকাত দেয় এবং এতো অধিক পরিমাণ দিয়ে দেয় যে, সম্পদের সঠিক হিসাব করলে যাকাতের পরিমাণ এর চেয়ে বেশী হবে না বরং কম হবে, তাহলে সম্পদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত দেওয়া হলে তা নফল দান বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, ঔষধের ম্যামো দেখে পূর্ণ স্টকের বর্তমান পাইকারী বাজারমূল্য বের করতে চেষ্টা করবে, তারপর ঐ অনুযায়ী শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হারে যাকাত আদায় করবে। (সূরা বাকারা-২৮৬, আল-ফিকহুল ইসলামী ১০/৭৯৩৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫২২-৫২৩, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৫/৯৩-৯৪)

আবরারুল হক
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

৪৪৮ প্রশ্ন: আজকাল অনেককে কাঁকড়া, অক্টোপাস, স্কুইড ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খেতে দেখা যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো খাওয়ার হুকুম কী? বৈধ হওয়ার কোন অবকাশ আছে কিনা? দলীলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

উত্তর: সামুদ্রিক ও জলজ প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মাছ হিসেবে পরিচিত প্রাণী খাওয়া জায়েয। মাছ ছাড়া অন্য যে কোন প্রাণী যেমন কাঁকড়া, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ প্রভৃতি খাওয়া নাজায়েয। প্রশ্নে উল্লিখিত অক্টোপাস, স্কুইড ইত্যাদি প্রাণী যেহেতু মাছ হিসেবে গণ্য নয়, তাই এসব খাওয়া জায়েয হবে না। বিশেষ অপারগতা থাকলে তা উল্লেখপূর্বক সমাধান জেনে নেয়া যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, কুরআন-হাদীস বা ফিকহের কিতাবাদিতে মাছের সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া নেই। তাই এ ব্যাপারে মৎস বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যেক অঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে যে প্রাণী মাছ হিসেবে পরিচিত, সেটিই মাছ বলে ধর্তব্য হবে এবং তা খাওয়া জায়েয হবে। আর যে প্রাণী মাছ হিসেবে প্রসিদ্ধ বা পরিচিত নয় তা খাওয়া জায়েয হবে না। (সূরা আ'রাফ-১৫৭, সূরা মায়িদা-৪,৫, সূরা ফাতির-১২, তাফসীরে কাবীর ১৫/৩৮১, আহকামুল কুরআন ২/৫৬৪, ৩/৪৮৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৪৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৩১৪, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৮৭১, শরহে মুশকিলুল আসার ৫/৩৪, উমদাতুল কারী ২১/১০৭, আল-আসল লি-মুহাম্মাদ ৫/৩৯৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৩০৬, বাদায়িউস সানায়ে ৫/৩৫, বিনায়া ১১/৬০৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ৫/২৮৯, কুদূরী ২০৭, হিদায়া ৯/৫০২, কানয ৬০১, আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ১১/২২০, মুহীতে বুরহানী ৬/৫৭)

মুনীর হুসাইন
চাঁদপুর

৪৪৯ প্রশ্ন: বর্তমানে কোনো কোনো পরিবারে ছেলে প্রবাসে থাকা অবস্থায় স্বদেশে বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার কারণে ছেলে স্বদেশে ফিরে আসার পূর্বেই ফোনের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এমতাবস্থায় যদি স্বদেশ থেকে মেয়ে বা মেয়ের কোনো অভিভাবক দুইজন সাক্ষীর সামনে ফোনে লাউড স্পীকারসহ অডিও বা ভিডিও কলের মাধ্যমে ছেলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে, আর তখনই অপর দিক থেকে ছেলে নিজেই তা কবুল করে যা মেয়ে বা মেয়ের অভিভাবক স্পষ্টভাবে শুনতে পায় এবং মেয়ের নিকট উপস্থিত সাক্ষীগণও নিজ নিজ কানে ছেলের কবুল করার আওয়াজ শুনতে পায় তাহলে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে কিনা?

উত্তর: বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম শর্ত হলো, বর-কনে অথবা তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকীল সশরীরে বিবাহের মজলিসে উপস্থিত হয়ে শরীয়ত নির্ধারিত দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবূল করা। এই শর্ত পাওয়া না গেলে বিবাহ সহীহ হবে না। প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে ফোনে লাউড স্পীকারসহ অডিও বা ভিডিও কলের মাধ্যমে বিবাহের ইজাব-কবুল করলে উল্লিখিত শর্ত পাওয়া যায় না বিধায় ফোনের মাধ্যমে উক্ত সূরতে বিবাহ সহীহ হবে না। বর-কনের মধ্য থেকে কেউ বিদেশে থাকলে তাদের বিবাহ সহীহ হওয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলো– বর/কনে ফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমে আস্থাভাজন কোনো ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে বলে দিবে যে, অমুকের সঙ্গে আপনি আমার বিবাহ সম্পাদন করে দিন। অতঃপর উক্ত উকীল শরীয়ত নির্ধারিত দু'জন সাক্ষীর সামনে মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বর/কনের সঙ্গে অথবা তাদের নিযুক্ত উকীলের সঙ্গে ইজাব-কবূল করে নিবে। এভাবে করা হলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। (মুসনাদে শাফেয়ী; হাদীস ২২, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হাদীস ১০৪৭৩, ১৩১২৯, বাদায়িউস সানায়ে ২/২৩২, রদ্দুল মুহতার ৩/২১-২৩, ৩/১০ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭-২৬৯, তাতারখানিয়া ৪/১২৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/২২৫, ফাতাওয়া উসমানী ২/৩০৫)

মুহাম্মদ রিযওয়ানুল হক
পোরশা, নওগাঁ

৪৫০ প্রশ্ন: (ক) বালেগা মহিলার আওয়াজ শোনা যাবে কিনা?

(খ) মহিলা মাদরাসাগুলোতে পর্দার আড়াল থেকে যেমন, দরজা বা জানালার কাছ থেকে বা মাইকের মাধ্যমে বালেগা মহিলার কাছ থেকে পুরুষ শিক্ষকগণ পড়া বা কিতাবের ইবারত শুনতে পারবে কিনা?

উত্তর: (ক) শরয়ী প্রয়োজনে পর্দার বিধান রক্ষা করে পরনারীর আওয়াজ শোনা বা তাদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি আছে। তবে প্রয়োজন ছাড়া কিংবা পর্দা লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের আওয়াজ শোনা বা তাদের সঙ্গে কথা বলা জায়েয নেই।

(খ) যদি ফেতনা-ফাসাদের আশঙ্কা না থাকে তাহলে পুরুষ শিক্ষক পর্দার ভেতরে থাকা বালেগা মহিলার কাছ থেকে পড়া বা কিতাবের ইবারত শুনতে পারবে এবং প্রয়োজনে কথাও বলতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় অন্তর পরিষ্কার রাখতে হবে; অন্তরে তাদের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে পড়ানো হলে কোন অবস্থায় জায়েয হবে না। (সূরা আহযাব-৫৩, সহীহ বুখারী; হাদীস ১২০৩, বাহর ১/২৮৫, রদ্দুল মুহতার ১/৪০৫-৪০৬, বাহর ১/২৮৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৯৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৬/২০৬-২০৭)

জাহিদ হাসান
কাউন্দিয়া, নয়াবাজার

৪৫১ প্রশ্ন: (ক) ছেলেদের জন্য হাতে বা গলায় রুপার বা অন্য কোন ধাতুর চেইন, ব্রেসলেট, আংটি ইত্যাদি পরা কি জায়েয? অনেক দীনদার লোক ও আলেমদেরকে পাথর ও বিভিন্ন রকমের আংটি পরতে দেখা যায়– এর শরয়ী হুকুম কী?

(খ) সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখতে গেলে পছন্দ হোক বা না হোক কম-বেশি হাদিয়া দেয়– এটা কি ঠিক? অনেকে এটাকে সম্মানের বিষয় হিসেবে দেখে থাকে।

উত্তর: (ক) পুরুষদের জন্য স্বর্ণের অলংকার পরিধান করা চাই তা আংটি হোক বা অন্য কিছু সর্বাবস্থায় হারাম। শুধুমাত্র হাতে রুপার আংটি (সাড়ে তিন মাশা তথা সিকি তোলা পরিমাণ ওজনের) পরিধান করা জায়েয আছে। এছাড়া অন্যান্য ধাতু যেমন, লোহা, পিতল, তামা ইত্যাদির আংটি, চেইন, ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরূহ। কেউ কেউ রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে চিকিৎসা স্বরূপ বিশেষ প্রকারের পাথরের আংটি ব্যবহারকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহের কিতাবে পাথরের আংটির ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, পাথরের আংটিও মাকরূহ হবে। তাই প্রয়োজনে সিকি তোলা পরিমাণ রুপার আংটি ছাড়া অন্য ধাতুর আংটি, চেইন ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা আবশ্যক। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২০৭৮, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৭৮৫, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১২৯৪১, তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৫৮, ৬/৩৬০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১৫৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৩৭, কিতাবুন নাওয়াযেল ১৫/৪২, ৪৬৩)

(খ) পাত্রী যেহেতু বেগানা মহিলা, তাই সে স্ত্রী হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সঙ্গে হবু স্বামীর সরাসরি হাদিয়া আদান-প্রদান জায়েয নেই। পাত্রী পছন্দ হয়ে থাকলে দেরি না করে বিয়ে করে নিবে এবং তার পর যতো ইচ্ছা তাওফীক অনুযায়ী হাদিয়া দিবে। তবে পাত্রের মা-বোন বা মহিলা আত্মীয়দের মধ্য থেকে কেউ নিঃশর্তভাবে কোন কিছু হাদিয়া দিতে চাইলে তা দিতে পারবে। (মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী; হাদীস ২৪৫৩, আল-মু'জামুল আওসাত; হাদীস ১৫২৬, মুসনাদে আবূ ইয়ালা; হাদীস ৬১৪৮, আল-মুহীতুল বুরহানী ৮/৩৪, বাহর ৬/৪৪১)

মুহাম্মদ আবু সাঈদ
সলিমুল্লাহ রোড, মুহাম্মদপুর

৪৫২ প্রশ্ন: (ক) আমি একটি বাড়ি করার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু বাড়ি করার মত পর্যাপ্ত মূলধন আমার কাছে নেই। এ জন্য আমি ইসলামী ব্যাংকে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে বলে, আমাদের এখান থেকে সরাসরি টাকা দেয়া হয় না; বরং আপনি যে পণ্য/মাল ক্রয় করবেন আমরা আপনাকে দোকান থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে দিবো এবং উক্ত পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারণ করে দিবো, যেটা আপনাকে ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জানার বিষয় হলো, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এ পদ্ধতিতে আমি কি তাদের থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবো? দ্বিতীয়ত আমি যদি ১০ বছরের মধ্যে উক্ত টাকা পরিশোধ করতে না পারি তাহলে তারা ধার্যকৃত টাকার অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করত পারবে কিনা এবং ধার্য করলে সেটা সুদের মধ্যে পড়বে কিনা?

(খ) কারো কাছ থেকে বাড়ি করার জন্য নগদ টাকা মূলধন হিসেবে নিয়ে তাকে কিছু লাভসহ ফেরত দেয়া যাবে কিনা? দিলে সেটা সুদের মধ্যে গণ্য হবে কিনা? যদি এটা সুদের মধ্যে পড়ে তাহলে আমি তাকে কিভাবে উপকৃত করতে পারি?

অনুরূপভাবে কেউ যদি লাভ ছাড়া নগদ টাকা দিতে না চায় তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমি কিভাবে টাকার ব্যবস্থা করতে পারি?

(গ) বাড়ী করার সময় আমি যদি কন্ট্রাকটরের সঙ্গে এভাবে চুক্তি করি যে, পারিশ্রমিকের টাকা কাজের শুরুতে নগদ পেমেন্ট করলে প্রতি স্কয়ার ফিট ১৫০ টাকা। আর কাজ শেষে একসঙ্গে পেমেন্ট করলে প্রতি স্কয়ার ফিট ২০০ টাকা। এভাবে টাকা কমবেশী করে দেয়া যাবে কিনা? আশা করি, কুরআন-হাদীসের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: (ক) শরীয়ত মতে কোন জিনিস নগদ মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে কিস্তিতে ক্রয় করা জায়েয আছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত সূরতে ব্যাংক থেকে কিস্তিতে দাম পরিশোধের শর্তে বাজারমূল্যের তুলনায় কিছুট বেশি দাম দিয়ে মাল ক্রয় করা জায়েয হবে। তবে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বেচাকেনার সময় বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় ও কিস্তির পরিমাণ নির্ধারিতভাবে উল্লেখ থাকা একান্ত অপরিহার্য। আর সামর্থ্য থাকতে সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করা ক্রেতার একান্ত কর্তব্য। বিনা কারণে টালবাহানা করলে তা যুলুম বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তার উপর আর্থিক জরিমানা বা মূল্য বৃদ্ধি করা কোনটিই জায়েয হবে না; বরং সেটা সুদের মধ্যে পড়বে। কাজেই নির্দিষ্ট মেয়াদে সম্পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে অতিরিক্ত চার্জ ধার্যের চুক্তিটি সুদী চুক্তি হওয়ায় অন্য কোথাও থেকে সুদবিহীন ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকলে এ জাতীয় ব্যাংকিং চুক্তিতে জড়িত হওয়া বৈধ হবে না। একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায়ের নিয়তে বৈধ হবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১২৩১, হিদায়া ৬/৫০৭, ফাতহুল কাদীর ৭/১৫৫, রদ্দুল মুহতার ৪/৫৩৩, ৫/১৪২, আল-বাহরুর রায়েক ৬/১২৪-৫, মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যা ১/২০৭, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা ১/১২, ১৫, ফাতাওয়া উসমানী ৩/১১৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ১০/২৯৯)

(খ) টাকা ঋণ নিয়ে কিছু লাভসহ ফেরত দেয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এ ধরণের লেনদেন করা জায়েয হবে না। তবে যদি ঋণগ্রহিতা সামাজিক প্রচলন কিংবা ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোন ধরণের চাপের সম্মুখীন না হয়ে এবং কোন ধরণের পূর্বশর্ত না করে নিজ থেকে খুশি হয়ে আলাদাভাবে অতিরিক্ত কিছু দিলে তা জায়েয আছে। তবে অতিরিক্তটুকু সুদী হিসাব তথা পূর্বচুক্তির ভিত্তিতে প্রদান করা কোনক্রমেই জায়েয নেই।

অনুরূপভাবে যথাসাধ্য সুদী লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। আর প্রয়োজনের মুহূর্তে সুদ ছাড়া টাকা যোগাড় করা না গেলে কী করণীয় তা বলার জন্য আগে প্রয়োজনটা কোন্ ধরণের, তা সবিস্তারে লিখিত আকারে ফাতাওয়া বিভাগে জানালেই এর শরয়ী হুকুম বলা সম্ভব। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৩৯৩, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী ১০৯৩৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা; হাদীস ২০৬৯০, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক; হাদীস ১৪৬৬১, রদ্দুল মুহতার ৫/১৬৫-৬৬, বাদায়িউস সানায়ে ৭/৩৯৫, ইমদাদুল আহকাম ৬/৮৩)

(গ) প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে পারিশ্রমিকের টাকা অগ্রীম পেমেন্ট করলে কম আর কাজ শেষে পেমেন্ট করলে বেশি দেয়ার চুক্তি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোন সমস্যা নেই। তবে অগ্রীম পেমেন্ট করা হবে, নাকি কাজ শেষে একসঙ্গে পেমেন্ট করা হবে তা কাজের শুরুতে চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায় এই চুক্তি জায়েয হবে না। (আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ১৫/১০৮, ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা ১৩৩, রদ্দুল মুহতার ৬/১০)

মুহাম্মাদ ইরফান
বাবর রোড, মুহাম্মাদপুর

৪৫৩ প্রশ্ন: আমার স্ত্রী তার আপন ভাইকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, 'লাভ হলে দিও, লস হলে কোন টাকা-পয়সা দেওয়া লাগবে না। আর ব্যবসা যদি লাভজনক না হয়, অথবা ব্যবসায় টাকা খাটাতে না পারো তাহলে আমার টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে দিও।' আনুমানিক ১০ বৎসরেরও বেশী সময় যাবৎ এভাবে টাকা খাটানো আছে। প্রথমে দেয়া হয়েছিল ১ লক্ষ, পরবর্তী সময়ে আরো কয়েক দফায় দিয়ে দিয়ে প্রদত্ত টাকা ১০ লাখেরও বেশী হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর ভাষ্য হলো, যতোবারই সে ভাইকে টাকা দিয়েছে, ততোবারই ঐ কথাগুলো (লাভ হলে দিও, লস হলে টাকা-পয়সা দেওয়া লাগবে না...) বলেই টাকা দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে তার ভাই মাসে মাসে যে লভ্যাংশ দিতো, সেটা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়াতে বাড়াতে পনেরো হাজার পর্যন্ত হয়েছিল এবং একবার লাভ বেশি হওয়ায় বিশ হাজারও দিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও ইতোপূর্বে কোন চুক্তি হয়নি যে, কত টাকার বিনিময়ে কত টাকা লাভ দিবে?

যাই হোক, আমি যখন আমার স্ত্রীকে বললাম যে, তোমার তো এভাবে অস্পষ্ট কথা বলে টাকা খাটানো উচিত হয়নি, তখন থেকে সে মাসে মাসে প্রদত্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়। এখন পুনরায় নতুনভাবে চুক্তির কথাবার্তা চলছে। জানার বিষয় হলো, আমার স্ত্রীর জন্য এভাবে টাকা খাটানো সহীহ হয়েছে কিনা? যদি সহীহ না হয়ে থাকে তাহলে এখন কী করণীয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: একজনের মূলধন এবং অপরজনের শ্রমের ভিত্তিতে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় সেটাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুযারাবা বলা হয়। মুযারাবা চুক্তিতে ব্যবসা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ব্যবসার শুরুতেই পুঁজিদাতা ও শ্রমদাতার লভ্যাংশের পরিমাণ অর্ধা-অর্ধি হারে অথবা এক-তৃতীয়াংশ বা শতকরা হারে নির্ধারণ করে নেয়া। প্রশ্নের বর্ণনামতে আপনার স্ত্রী ও তার ভাইয়ের মধ্যকার ব্যবসায়িক চুক্তিতে যেহেতু পুঁজিদাতা ও শ্রমদাতার লভ্যাংশের পরিমাণ অর্ধা-অর্ধি অথবা এক-তৃতীয়াংশ বা শতকরা হারে নির্ধারণ করা হয়নি, সেহেতু তাদের এই চুক্তি-ই সহীহ হয়নি। তাছাড়া আপনার স্ত্রীর এভাবে শর্ত করা যে, 'লাভ হলে দিও, লস হলে কোন টাকা-পয়সা দেওয়া লাগবে না।' এটা ফাসেদ শর্ত বলে গণ্য হবে। আর ফাসেদ শর্তের কারণে ব্যবসাও ফাসেদ হয়ে যায়। আর ফাসেদ ব্যবসার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, সম্পূর্ণ লাভ-লোকসান পুঁজিদাতার হবে, আর শ্রমদাতা বাজারমূল্য হিসেবে শ্রমের পারিশ্রমিক পাবে। প্রশ্নের বর্ণনামতে আপনার স্ত্রীর পুঁজি ও তার ভাইয়ের শ্রমে পরিচালিত ব্যবসা যেহেতু ফাসেদ শর্তের কারণে ফাসেদ হয়ে গেছে সেহেতু এ ব্যবসার সম্পূর্ণ লভ্যাংশ পুঁজিদাতা অর্থাৎ আপনার স্ত্রী পাবে, আর শ্রমদাতা অর্থাৎ তার ভাই শ্রমের যথার্থ পারিশ্রমিক পাবে। এখন তার পারিশ্রমিক কী পরিমাণ হওয়া দরকার, তা নিজেরা পরামর্শ করে ঠিক করে নিবেন এবং তিনি ইতোমধ্যে এই ব্যবসা থেকে কত টাকা গ্রহণ করেছেন তা-ও নিজেরা হিসাব করে নিবেন। আর ভবিষ্যতে নতুনভাবে মুযারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে মুযারাবার সকল শর্ত মেনে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ৪/২৯৫-৯৭, রদ্দুল মুহতার ৫/ ৬৪৬,৪৮, আল-বাহরুর রায়েক ৭/২৬৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৪১, ৪৬)

রা হ মা নি য়া সং বা দ

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া একটি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান। জমিদাতাগণ ওয়াকফ দলীলমূলে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়ভার পরিচালনা কমিটিকে অর্পণ করেন। পরিচালনা কমিটিও ওয়াকিফদের শর্তাবলী এবং জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সংঘ-স্মারকে বিদ্যমান আইন-কানুন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করে আসছিলেন।

অতঃপর প্রতিষ্ঠানের সর্বসম্মত কিছু আইন-কানুন ভঙ্গ করার সূত্রে তৈরি হওয়া মতবিরোধের জের ধরে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর বিকেল থেকে রাত্রিনাগাদ সংঘটিত এক সহিংস জবরদখলকাণ্ডে জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার পাঁচতলা ভবন পরিচালনা কমিটির হাতছাড়া হয়ে যায়। ভবন বেহাত হওয়ার পর পরিচালনা কমিটি প্রতিকার চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন এবং চার ধরণের আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ শুনানীর পর ২১/০৬/২০০৭ খ্রিস্টাব্দে পরিচালনা কমিটির পক্ষে রায় ঘোষণা করেন এবং ১০/০৭/২০০৮ তারিখে জবরদখলকারী-দের উচ্ছেদ করত ভবনটি পরিচালনা কমিটিকে বুঝিয়ে দেয়ার তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু কিছু অজ্ঞাত কারণে উচ্ছেদ অর্ডারটি তখন বাস্তবায়ন করা হয়নি। অতঃপর ২৮/০৪/২০০৯ তারিখে দ্বিতীয়বার উচ্ছেদের তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং সব ধরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর এবারও কোন অজ্ঞাত কারণে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

অবশেষে হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ ও সুপ্রীমকোর্টের ফুলবেঞ্চের পূর্বপ্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে ২৯/০৬/২০২১ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার উচ্ছেদ অর্ডার দেয়া হয়।

সে মতে ১৯ জুলাই, সোমবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশফোর্স নিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে আসেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আসার ঘণ্টা দুয়েক আগেই দখলদাররা ভবনের সকল দরজা ও গেটে তালা ঝুলিয়ে চাবি নিয়ে প্রস্থান করে। অগত্যা ম্যাজিস্ট্রেট তালাগুলো ভেঙে জামি‘আ রাহমানিয়ার পরিচালনা কমিটির বর্তমান মুতাওয়াল্লী ও সভাপতি আব্দুর রহিম সাহেবের নিকট জনশূন্য ভবনটি বুঝিয়ে দেন।

ভবন বুঝে পাওয়ার পর মুতাওয়াল্লী সাহেব বিকেল চারটা নাগাদ কমিটির অন্যান্য সদস্য, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রদেরকে নিয়ে মাদরাসার গেটে উপস্থিত হন এবং মুরুব্বী শিক্ষকদেরকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং মাদরাসার কার্যক্রম জারী করার আহ্বান জানান। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং ২০ বছরের দু'আ, কান্নাকাটি ও আল্লাহর সমীপে রোনাজারীর ফলাফল।

অতঃপর উপস্থিত সকলে বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ তা'আলার মৌখিক শোকরিয়া আদায় করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং ৪র্থ তলার ছাত্রমিলনায়তনে উপস্থিত হন। ৪র্থ তলায় পৌঁছার পর মুরব্বী শিক্ষকগণ উপস্থিত সকলকে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায়ার্থে দুই রাকাত নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। অতঃপর কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে শোকরানা বয়ান শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে মুরুব্বী শিক্ষকগণ ও কমিটিবৃন্দ তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করত উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকদেরকে মাদরাসার সর্বসম্মত কানুনসমূহের অনুগামী থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে প্রায় নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত আসানীর সাথে ২০ বছরের অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান ঘটে।

ভবন সংস্কার কার্যক্রম

দীর্ঘ ২০টি বছর 'রাহমানিয়া ভবন' বৈধ কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া থাকার দরুন সংস্কারের অভাবে ভবনটি যারপরনাই জীর্ণ ও বসবাস-অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। ভবনের প্রবেশপথে সুদৃশ্য তোরণ থাকলেও ভেতরে ছিল একেবারে নাজেহাল অবস্থা; এক শ্বাসরুদ্ধকর গুমোট পরিবেশ। জায়গায় জায়গায় দেয়ালের আস্তর খসে পড়া। ছাদের বিভিন্ন অংশে রড বের হয়ে আছে। পঞ্চম তলার ছাদ চুইয়ে বিভিন্ন জায়গা ময়লা পানিতে সয়লাব। ভবনের বাইরে ১/২ বার রঙ করানো হলেও ভেতরে রঙ করানোর কোন আলামত ছিল না। বিশেষত টয়লেটগুলো ছিল ব্যবহারের একেবারেই অনুপযুক্ত। এককথায় অবহেলিত ভবনের বোবাকান্নায় প্রথম দর্শনেই বৈধ কর্তৃপক্ষের সকলেই ছিল অশ্রুসজল, নির্বাক।

বৈধ কর্তৃপক্ষ ভবনের প্রবেশ করেন আসরের নামাযের আগ-মুহূর্তে। বাদ মাগরিব ৩য় তলার মেহমানখানায় পরিচালনা কমিটির বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে অবহেলিত ও জরাজীর্ণ ভবনটিকে বাসযোগ্য করে তুলতে পরদিন হতেই সংস্কার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাথমিকভাবে একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকার বাজেট মঞ্জুর করা হয়। সে মতে পরদিন হতেই ৪/৫ ধরনের মিস্ত্রী কাজে লাগানো হয়। সীমানাপ্রাচীরের নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং ৫ম তলার বারান্দায় শিশুশিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য গ্রিল সংযোজনের জন্য গ্রিলমিস্ত্রীদের কাজে লাগানো হয়। টয়লেট ভেঙে ব্যবহারযোগ্য-করণ ও সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তনের জন্য স্যানিটারী-মিস্ত্রীদের কাজে লাগানো হয়। ছোট ছোট কামরা ভেঙে প্রশস্ত দরসগাহ তৈরির জন্য রাজমিস্ত্রী এবং পুরো ভবনের ফ্লোরগুলোর ক্ষয়ে যাওয়া নেটফিনিশিং তুলে টাইলস লাগানোর জন্য টাইলস-মিস্ত্রীদের কাজে লাগানো হয়। ভবনের ভেতরের পুরো অংশ রঙ করানোর জন্য রঙমিস্ত্রী লাগিয়ে দেয়া হয়। মুরুব্বী শিক্ষকদের সুবিধার্থে তাদের আরামগাহগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচড টয়লেট নির্মাণ করা হয়। ২য় তলার কক্ষসমূহে উন্নত মানের কার্পেটের ব্যবস্থা করা হয়। পানির পাম্প নষ্ট থাকায় নতুন একটি সাবমারসিবল পাম্প বসানো হয়। প্রথমধাপে দ্রুতগতিতে এ সকল জরুরী সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে ভবনের বাইরের অংশ রঙ করানো, ছাদের পানি চোয়ানো বন্ধ করার জন্য পুরো ছাদের জলছাদ ভেঙ্গে নতুন করে ঢালাই দেয়া এবং ভবনের উত্তর পার্শ্বের চারতলা বিশিষ্ট বর্ধিত অংশে টয়লেট, গোসলখানা, রান্নাঘর, পানির হাউজ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বাজেট নির্ধারণ করা হয় ৩০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় ধাপের এই সংস্কার কাজের মধ্যে ভবনের বাইরের অংশে রঙের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর পার্শ্বের বর্ধিত অংশের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ তলায় টয়লেট,

গোসলখানা, স্টোররুম নির্মাণ করা হয়েছে। ২য় তলায় যা মূল ভবনের ৩য় তলার লেভেলে আছে, রান্নাঘর ও পানির হাউজ তৈরি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, শুরুতে ভবনের নিচতলায় রান্নাঘর ছিল। ভবনটি বৈধ কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হওয়ার পর রান্নাঘরটি ছাদের উপর স্থানান্তর করা হয়েছিল। ছাদের বিভিন্ন স্থান ফেটে যাওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার ৭/৮দিন পরও চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়তে থাকে। এভাবে মূল ছাদও ড্যামেজ হয়ে গেছে। ছাদের নিচের অংশের ঢালাই খসে খসে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গায় রড বেরিয়ে জং ধরে গেছে। ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শে মূলছাদের সুরক্ষার জন্য বর্তমানে ছাদের রান্নাঘর ভেঙে দিয়ে ৩য় তলার বর্ধিত অংশে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জলছাদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মূলছাদের ড্যামেজ মেরামত করে পুনরায় জলছাদ ঢালাই দেয়া হবে।
উল্লিখিত দুই ধাপের সংস্কার কাজে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। মাসখানেক আগে ৪র্থ তলার ছাত্রমিলনায়তনে ৩লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ বাকি রয়েছে, যেগুলো চতুর্থ ধাপে করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বয়োবৃদ্ধদের ওঠানামার সুবিধার্থে একটি ক্যাপসুল লিফট সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে। লিফটের খাতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা কার্যক্রম

১৪৪২-৪৩ হিজরী মোতাবেক ২০২১-২২ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষে ঈদুল আযহার মাত্র দু'দিন আগে বৈধ কর্তৃপক্ষ রাহমানিয়া ভবন বুঝে পান। শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়ার সুযোগ না থাকায় জামি'আতুল আবরারে অবস্থানরত কয়েকটি শ্রেণী যথা: শরহে বেকায়া, জালালাইন, মেশকাত, ইফতা, তাফসীর ও দাওয়াহ বিভাগের চারশতাধিক শিক্ষার্থীকে রাহমানিয়া ভবনে নিয়ে আসা হয়। এ সময় যে সব লোক গত ২০ বছর ভবনটিতে ছিল তাদের মাল-সামানা ভেতরে থাকায় এবং পাশাপাশি সংস্কার কাজ চলতে থাকায় এর চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী এখানে রাখার উপায় ছিল না। ফ্লোরে টাইলস বসানোর প্রয়োজনে প্রতি তলার অর্ধেকটা সবসময় খালি রাখতে হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের পালাক্রমে কক্ষ পরিবর্তন করে অবস্থান করতে হয়েছে। গত শিক্ষাবর্ষটি মোটামুটি এভাবে কেটে গিয়েছে।
চলতি ১৪৪৩-৪৪ হিজরী মোতাবেক ২০২২-২৩ ঈসায়ী শিক্ষবর্ষে অভ্যন্তরীণ সংস্কার কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হওয়ায় শুরু থেকেই সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। এ বছর ৫ম তলাটি মক্তব, নাযেরা ও হিফজ বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত শিক্ষাবর্ষে সংস্কার কাজ চলমান থাকায় ৫ম তলা কিতাব বিভাগের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ ছিল। ফলে অনিবার্যভাবে সেখানে মক্তব, নাযেরা ও হিফজ বিভাগের ছাত্রদের রাখার সুযোগ ছিল না। অভিভাবকদের উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও সংস্কার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে গত বছর আর শিশুদেরকে ভর্তি করা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ! সংস্কার কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হওয়ায় মহল্লাবাসীর অনুরোধ রক্ষা করে রমাযানের শুরু থেকেই রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষ নতুন শিক্ষাবর্ষে শিশুশ্রেণী-গুলোতে ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মতে সকলের অবগতির জন্য মাদরাসার মূল ফটকে মক্তব, নাযেরা ও হিফজ বিভাগের ভর্তিবিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেয়া হয়। অভিভাবকগণ রামাযানের শুরু থেকেই এই তিন বিভাগে সন্তানদের ভর্তি করাতে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ! রমাযান ও রমাযানের পরবর্তী দুই দিনে এই তিন বিভাগের কোটা পূর্ণ হয়ে যায়। কোটা পূর্ণ হওয়ার পর অনেক অভিভাবক সন্তান ভর্তি করাতে না পেরে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে গেছেন।

চলতি শিক্ষাবর্ষ:

১৪৪৩-৪৪ হিজরী মোতাবেক ২০২২-২৩ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ও তার বর্ধিত ক্যাম্পাস জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ার মোট ছাত্রসংখ্যা ২১০০ জনের কাছাকাছি। রাহমানিয়া ভবন ও বর্ধিত ভবন জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া উভয় ক্যাম্পাসে মক্তব, নাযেরা ও হিফজ বিভাগ রাখা হয়েছে। কিতাব বিভাগের তাইসীর থেকে শরহে জামী পর্যন্ত ছয় শ্রেণীর ছাত্রদের ভর্তি জামি'আতুল আবরারের নামে নেয়া হয়েছে এবং তারা জামি'আতুল আবরারের ক্যাম্পাসেই অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, এ বছর ছাত্রসংখ্যা বেশি হওয়ায় আবরারের এক-এক ফ্লোরে এক-এক শ্রেণীকে রাখা হয়েছে। দশতলা ভবনের নিচতলায় গ্যারেজ, রান্নাঘর। ২য় তলায় প্রশাসনিক কার্যক্রম ও উলূমুল হাদীস বিভাগ। ৩য় তলায় শরহে জামী ও তাফসীর বিভাগ। ৪র্থ তলায় কাফিয়ার (ক,খ) দুই গ্রুপ, আদব বিভাগ, দাওয়াহ বিভাগ ও কুতুবখানা। ৫ম তলায় হেদায়াতুন্নাহু (ক,খ) দুই গ্রুপ। ৬ষ্ঠ তলায় নাহবেমীর (ক,খ,গ) তিন গ্রুপ। ৭ম তলায় মীযানের (ক,খ, গ) তিন গ্রুপ। ৮ম তলায় তাইসীর (ক,খ,গ) তিন গ্রুপ। ৯ম তলায় হিফজ বিভাগ এবং ১০ম তলায় মক্তব, নাযেরার ছাত্ররা অবস্থান করছে। ছাত্রদের ওঠানামার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে এই ভবনে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'টি শক্তিশালী লিফট স্থাপন করা হয়েছে।
শরহে বেকায়া থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদীস ও ৫টি তাখাসসুসের ছাত্রদের ভর্তি জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নামে নেয়া হয়েছে। এই শ্রেণীগুলোর শিক্ষার্থীরা রাহমানিয়া ভবনে অবস্থান করছে। তবে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ৫টি তাখাসসুসের ৪টি যথা তাফসীর, উলূমুল হাদীস, দাওয়াহ ও আদব বিভাগকে জামি'আতুল আবরারে রাখা হয়েছে।
রাহমানিয়া ভবনের নিচতলার দক্ষিণ পার্শ্বে ইফতা বিভাগ অবস্থান করছে। (ছাত্রসংখ্যা ৩৯ জন।) আর উত্তর পার্শ্ব দাওরায়ে হাদীসের আংশিক ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২য় তলার দক্ষিণ পার্শ্ব অফিস কক্ষ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আর উত্তর পার্শ্ব দাওরায়ে হাদীসের দরসগাহ ও ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বছর দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রসংখ্য ১৯০ জন। ৩য় তলার দক্ষিণে মেহমানখানা, নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের অফিসকক্ষ ও মেশকাত জামাআতের দরসগাহ। আর উত্তরে মেশকাতের ছাত্রাবাস (ছাত্রসংখ্যা ১০৫ জন), বোর্ডিং ম্যানেজার ও স্টাফদের আরামগাহ ও স্টোর রুম হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্ধিতাংশে নতুন রান্নাঘর চালু করা হয়েছে। ৪র্থ তলার ছাত্রমিলনায়তনের দক্ষিণে অবস্থান করছে শরহে বেকায়া জামাআত, ছাত্রসংখ্যা ৯০ জন। আর উত্তরে অবস্থান করছে জালালাইন জামাআত, ছাত্রসংখ্যা ১০৭ জন। ৫ম তলার দক্ষিণে রয়েছে হিফজ বিভাগের ৫টি গ্রুপ, মোট ছাত্রসংখ্যা ১০০ জন। আর উত্তরে অবস্থান করছে মক্তব ও নাযেরা বিভাগের শিক্ষার্থীগণ, ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জন। এ বছর রাহমানিয়া ভবনে কিতাব বিভাগের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা অবস্থান করায় তাদের

থাকা ও চলাফেরার জায়গাও বেশি লাগছে। ফলে এখানে অবস্থান করছে ৮০০ জন ছাত্র আর জামি'আতুল আবরারে ১৩০০ জন।

কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন: গত শিক্ষাবর্ষে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শিক্ষার্থীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এতে সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে– ফযীলত মারহালায় (মেশকাত) ৩০ জন, সানাবিয়া উলইয়াতে (শরহে বেকায়া) ১০ জন, মুতাওয়াসসিতায় (নাহবেমীর) ৫৪ জন এবং হিফজুল কুরআনে ১ জন। সর্বমোট ৯৫ জন।

বর্ধিত দীনী তৎপরতা

(১) সুধী সমাবেশ: বৈধ কর্তৃপক্ষ রাহমানিয়া ভবন বুঝে পাওয়ার পর উম্মতের সর্বস্তরে দীনী তৎপরতা আরও ব্যাপক করার সিদ্ধান্ত নেন। সে মতে এলাকাবাসী ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে নিয়ে একটি সুধীসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে দীনী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং রাহমানিয়ার বহুমুখী খিদমতে সকলকে সহযোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

(২) উলামা সম্মেলন: ধর্মীয় শিক্ষা বঞ্চিত অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের সরলমনা মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী, বিদেশী এনজিও ও খ্রিস্টান মিশনারীরা বেঈমান বানানোর যে নীলনকশার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে এ ব্যাপারে ঢাকার আলেমসমাজের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও কর্তব্য নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি উলামা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে দেশের উত্তরাঞ্চলে কাদিয়ানী ও খ্রিস্টান মিশনারী ফিতনার ভয়াবহতা তুলে ধরে এ ব্যাপারে জামি'আ রাহমানিয়ার কর্মতৎপরতার রূপরেখা পেশ করা হয়। অতঃপর ঢাকার সকল বড় বড় প্রতিষ্ঠানের একটি করে শাখা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক পর্যায়ে নূরানী মক্তব হলেও) উত্তরবঙ্গে চালু করার আহ্বান জানানো হয়।

উপস্থিত বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন। সম্মেলনে উপস্থিত শতাধিক উলামায়ে কেরামের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন– জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগের শাইখুল হাদীস মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেব দা.বা., জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের মুহতামিম মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব দা.বা., মারকাজুল উলূম খুলনার মুহতামিম মুফতী গোলামুর রহমান সাহেব দা.বা. কামরাঙ্গীর চর মোমিনবাগ মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইসমাঈল যশোরী সাহেব দা.বা., নরসিংদী দত্তপাড়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা শওকত হুসাইন সরকার সাহেব দা.বা., ধানমণ্ডি ঈদগাহ মসজিদের খতীব মাওলানা মুনাওওয়ার হুসাইন সাহেব দা.বা., জামি'আ ইমাম বুখারী উত্তরার মুহতামিম মাওলানা ওয়াহিদুল আলম সাহেব দা.বা. প্রমুখ।

ফুযালা সম্মেলন ২০২১

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া হতে শিক্ষাসমাপনকারী ফুযালায়ে কেরাম যেন পিতৃতুল্য শিক্ষকগণের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পারেন এবং এর মাধ্যমে দীনের সঠিক চেতনা ও নিরাপদ কর্মপন্থার উপর অবিচল থাকতে পারেন এ উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া। সংগঠনটি বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন, দ্বিমাসিক রাবেতা প্রকাশ, ধর্মবিমুখ জনসাধারণকে ধর্মভীরু বানানোর প্রচেষ্টা, দুর্যোগ কবলিত মানুষের মাঝে নিরলস সেবা প্রদান প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। গত ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া তার নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২০ বছরের ফুযালায়ে কেরামকে নিয়ে বার্ষিক ফুযালা সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনটি রাহমানিয়া ভবনের ৪র্থ তলার ছাত্রমিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পনেরো শতাধিক ফুযালায়ে কেরামের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ বিশ বছর রাহমানিয়া ভবনের স্পর্শবঞ্চিত প্রাক্তন ফুযালায়ে কেরাম সম্মেলনে শরীক হতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সম্মেলন উপলক্ষে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া 'জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া: ইতিহাস ও উপদেশ' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এতে সংক্ষিপ্তাকারে জামি'আ রাহমানিয়ার গঠনতন্ত্র, পরিচালনা পর্ষদের মিটিং-এর রেজুলেশন, মজলিসে শুরার অধিবেশন, আদালতের রায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের আলোকে রাহমানিয়া প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, বিভেদ-বিভাজনের ইতিকথা, জবরদখল-নৈরাজ্য ও দখলমুক্তির বিবরণ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। রাহমানিয়ার প্রকৃত ইতিহাস জানতে আগ্রহীদের স্মারকগ্রন্থটি পড়া উচিত।

বার্ষিক মাহফিল ২০২১ ও দস্তারবন্দী

জামি'আ রাহমানিয়া প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই প্রতিবছর দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সাতমসজিদ চত্বরে বার্ষিক ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করে আসছিল। গত দুই দশক ধরে রাহমানিয়া ভবন বৈধ কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া থাকায় এই কার্যক্রম বন্ধ ছিলো। গত বছর থেকে আবারও সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে মতে ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ ঈসায়ী তারিখে ঐতিহাসিক সাতমসজিদ চত্বরে বার্ষিক ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে তাশরীফ রাখেন আল-হাইয়াতুল উলইয়ার চেয়ারম্যান, বেফাক-সভাপতি মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমূদুল হাসান দা.বা.। বিশেষ মেহমান হিসেবে বয়ান পেশ করেন বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান মুফতী ইনআমুল হাসান দা.বা., ধানমণ্ডি ঈদগাহ মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা মুনাওয়ার হুসাইন সাহেব দা.বা., জামি'আ ইমাম বুখারী উত্তরার মুহতামিম মাওলানা ওয়াহিদুল আলম সাহেব দা.বা.। বাদ ইশা বিগত ৩ বছরের ফারেগীন হাফেজে কুরআন ও মাওলানাদের দস্তারে ফযীলত অর্থাৎ সম্মানসূচক পাগড়ী প্রদান করা হয়। সাতমসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় মুসল্লিয়ানে কেরাম বহুবছর পর এলাকার মাহফিলে শরীক হতে পেরে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন এবং মাহফিলটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হজ্জ প্রশিক্ষণ ও হাজী-পুনর্মিলনী

জামি'আর শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. দীর্ঘ তিনদশক ধরে হজ্জ-গমনেচ্ছুদের হাতে-কলমে হজ্জ-প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ বছরও শাওয়াল মাসের শেষ সপ্তাহে শতাধিক হজ্জ-গমনেচ্ছুদের অংশগ্রহণে রাহমানিয়ার তৃতীয় তলায় ৬দিন ব্যাপী হজ্জপ্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এবং হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হাজী সাহেবানদের নিয়ে হাজী-পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও ঐতিহাসিক সাতমসজিদে প্রতিদিন বাদ আসর জরুরী তা'লীম, ১০মিনিটের মেহনত, সপ্তাহে একদিন নামাযের আমলী মশক, গাশত ও ২৪ ঘণ্টার তাবলীগ জামাআত এবং প্রতি মঙ্গলবার বাদ ইশা তাফসীরুল কুরআন মজলিস শুরু করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল মেহনত কবুল করুন।